দেখিয়া যদি আমার মন দুঃখিত হইত তবে আমি মুশরিক হইয়া যাইবার ভয় করিতাম।" আকাশে রিযিক বলিয়া আল্লাহ্ এইজন্য উল্লেখ করিয়াছেন যেন লোকে বুঝিতে পারে যে, জীবিকার উপর কাহারও হাত নাই।

কতক লোক হযরত জুনায়দের (র) নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল–"আমরা আমাদের জীবিকা অন্বেষণ করিতেছি।" তিনি বলিলেন–"জীবিকা কোথায় আছে জানা থাকিলে অন্বেষণ কর।" তাহারা আবেদন করিল–"আল্লাহ্র নিকট চাহিব।" তিনি বলিলেন–"যদি বুঝিয়া থাক যে, তিনি তোমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছে তবে স্মরণ করাইয়া যাও।" তাহারা বলিল–"তবে আল্লাহ্র উপর ভরসা করিয়া দেখি কি হয়।" তিনি বলিলেন–"পরীক্ষার জন্য তাওয়াক্কুল করিলে তিনি যে জীবিকা দিবেন, ইহাতে সন্দেহ করা হয়।" অবশেষে তাহারা নিবেদন করিল–"তাহা হইলে আমরা কি তদবীর করিব?" তিনি বলিলেন–"সকল তদবীর হইতে বিরত থাক।"

মোটের উপর কথা আল্লাহ্ যে জীবিকা দানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট। রিযিক অন্বেষণকারীকে তাহার দিকেই মনোনিবেশ করা উচিত।

দ্বিতীয় মকাম–যে-ব্যক্তি এক বৎসরের খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখে সে তাওয়াক্কুলধারী লোকের শ্রেণী হইতে বহিষ্কার হইয়া পড়ে। কেননা সেই ব্যক্তি জীবিকার অদৃশ্য কারণ আল্লাহ্কে পরিত্যাগপূর্বক বাহ্য কারণের উপর নির্ভর করে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বৎসর ঘুরিয়া আসে। প্রত্যেক বৎসরেই বাহ্য বস্তুর উপর ভরসা থাকিলে আল্লাহ্র উপর ভরসা হইবে কিরূপে? তবে যে-ব্যক্তি ক্ষুধার সময়ে উদরপূর্তির পরিমিত খাদ্য ও প্রয়োজনের সময়ে শরীর ডাকিবার উপযুক্ত বস্ত্র পাইয়া পরিতুষ্ট থাকে তাহার তাওয়াক্কুল অক্ষুণ্ন থাকে। হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (র) বলেন–"চল্লিশ দিনের খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হইবে না; কিন্তু তদপেক্ষা অধিক সঞ্চয় করিলে নষ্ট হইবে।" হযরত সহল তস্তরী (র) বলেন–"পরিমাণে যতই হউক না কেন, সঞ্চয় করিয়া রাখিলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হইবে।" হযরত আবূ তালিব মক্কী (র) বলেন –চল্লিশ দিনের অপেক্ষা অধিক খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াও যদি সেই সঞ্চিত দ্রব্যের উপর ভরসা করা না হয় তবে তাওয়াক্কুল হইবে না।"

হযরত বিশরে হাফীর (র) অন্যতম মুরীদ হযরত হুসায়ন মুগাযানী (র) বলেন–"একদা একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি হযরত বিশরে হাফীর (র) নিকট উপস্থিত

হইলেন। তিনি আমাকে একমুষ্টি রৌপ্যমুদ্রা দিয়া উত্তম ও সুস্বাদু খাদ্য ক্রয় করিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। ইতঃপূর্বে তাঁহার এরূপ খাদ্য সংগ্রহের আদেশ আমি কখনও শুনি নাই। আমি তাহার আদেশমত খাদ্য আনিয়া উপস্থিত করিলাম। তিনি সেই প্রৌঢ় ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া আহার করিলেন। ইহার পূর্বে আমি তাঁহাকে কখনও অন্যের সহিত একত্রে আহার করিতে দেখি নাই। আহার শেষে দেখা গেল বহু খাদ্য বাঁচিয়া গিয়াছে। সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি উদ্বৃত্ত খাদ্য বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। বিনা অনুমতিতে খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইতে দেখিয়া আমি আশ্চর্য বোধ করিলাম। হযরত বিশ্রে হাফী (র) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–'তুমি আশ্চর্য বোধ করিতেছ?' আমি বলিলাম–'হাঁ।' তিনি বলিলেন–'আগন্তুক হযরত ফতেহ মওসেলী। তিনি মওসেল শহর হইতে অদ্য আমার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়াছিলেন এবং আমাকে এই শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য তুলিয়া লইয়া গেলেন যে, আল্লাহ্র উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল হইয়া গেলে সঞ্চয় করিয়া রাখিলেও কোন ক্ষতি হয় না।"

যাহা হউক, বাস্তব কথা এই যে, অল্প আশা তাওয়াক্কুলের মূল। ইহার সাধারণ নিয়ম এই যে, নিজের জন্য সঞ্চয় করা উচিত নহে। আবার সঞ্চয় করিয়া সঞ্চিত ধনকে আল্লাহ্র ধনভাণ্ডারের ধনের ন্যায় মনে করিলে এবং সঞ্চিত সম্পদের উপর ভরসা না করিলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হয় না। এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা পরিবারবিহীন একক লোকের সম্বন্ধে বর্ণিত হইল।

পরিবারের জন্য সঞ্চয় ও তাওয়াক্কুল–পরিবারবিশিষ্ট লোক এক বৎসরের জীবিকা সংগ্রহ করিয়া রাখিলে তাহার তাওয়াক্কুল নষ্ট হইবে না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক সময়ের উপযোগী দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হইবে। রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লাম স্বীয় পরিবারবর্গের জন্য এক বৎসরের খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া দিতেন। পরিজনবর্গের হৃদয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল বলিয়াই তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিতেন। তিনি নিজের জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আবশ্যক খাদ্য-দ্রব্যও জমাইয়া রাখিতেন না। অথচ সঞ্চয় করিয়া রাখিলেও তাঁহার তাওয়াক্কুল নষ্ট হইত না। কারণ, তিনি নিজের হস্তস্থিত ধন ও অপরের হস্তস্থিত ধনকে সমান মনে করিতেন। তবে সাধারণ লোকের মানসিক দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি সঞ্চয়ের সহজ নিয়ম শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আস্হাবে সুফ্ফার অন্তর্ভুক্ত এক সাহাবী

(রা) ইন্তিকাল করিলে লোকে তাঁহার বস্ত্র হইতে দুইটি স্বর্ণমুদ্রা পাইল। তাঁহার সম্বন্ধে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লাম বলিলেন–"তাঁহার উপর দুইটি দাগ হইবে। এইরূপ দাগ পড়ার দুই কারণ হইতে পারে। প্রথম, হয়ত কোন অভিপ্রায়ে তিনি নিজকে পরিবারবিহীন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং এইজন্য শাস্তিস্বরূপ অগ্নির দুইটি দাগ হইবে; অথবা ইহাও হইতে পারে না, তিনি কোন ভাণ করেন নাই, কিন্তু সঞ্চয় করত তাঁহার পারলৌকিক মর্যাদার হানি করিয়াছেন। মুখমণ্ডলে দুইটি দাগ থাকিলে যেমন সৌন্দর্যের হানি হয়, সঞ্চয়ের দরুন তদ্রূপ তাঁহার পারলৌকিক মর্যাদারও হানি ঘটিবে। যেমন অপর এক সাহাবী (রা) ইন্তিকাল করিলে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লাম বলেন–"কিয়ামত দিবস তাঁহার বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। কিন্তু তাঁহার স্বভাবের মধ্যে একটি অভ্যাস না থাকিলে তাহার বদনমণ্ডল সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইত। সেই অভ্যাসটি এই–সেই সাহাবী এক শীতের বস্ত্র অপর শীতের জন্য রাখিয়া দিতেন এবং এক গ্রীষ্মের বস্ত্র অপর গ্রীষ্মের জন্য রাখিতেন।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লাম বলেন–"ইয়াকীন ও সবর তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম দেখিতেছি।" অর্থাৎ এক মৌসুমের বস্ত্র অপর মৌসুমের জন্য রাখিয়া দেওয়া ইয়াকীন (আল্লাহ্‌র উপর অটল বিশ্বাস) কম হওয়ার কারণেই হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে সকলেই একমত যে, দস্তরখান, কলসী, লোটা, পিয়ালা প্রভৃতি যাহা সর্বদা ব্যবহারে লাগে তৎসমুদয় জমাইয়া রাখা দুরস্ত আছে। ইহার কারণ এই যে, অন্ন-বস্ত্র নানাবিদ উপকরণে প্রতি বৎসরই উৎপন্ন হইয়া থাকে; অপরপক্ষে তৈজসপত্র সব সময় উৎপন্ন হয় না এবং আল্লাহ্‌র স্থাপিত নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা দুরস্ত নহে। কিন্তু গ্রীষ্মের বস্ত্র শীতের সময়ে কাজে লাগে না। তাই ইহা পরবর্তী গ্রীষ্মের জন্য রাখিয়া দেওয়া দুর্বল বিশ্বাসের নিদর্শন।

নিরুদ্বেগে ইবাদতের জন্য সঞ্চয় উত্তম– সঞ্চয় করিয়া না রাখিলে যাহার মন চঞ্চল থাকে এবং অপরের মুখাপেক্ষা হয়, তাহার পক্ষে সঞ্চয় করাই উত্তম। আবশ্যক পরিমাণ শস্যক্ষেত্র না রাখিলে যাহার মন নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারে না এবং নিশ্চিন্ত মনে যিকির ও আল্লাহ্‌র চিন্তায় নিমগ্ন হইতে পারে না, তাহার পক্ষে পরিমিত শস্যক্ষেত্র রাখাই উত্তম ব্যবস্থা। এই সকল বিষয়ে মনের শান্তি অক্ষুণ্ন রাখিয়া নিরুদ্বেগে আল্লাহ্‌র যিকিরে মগ্ন থাকাই একমাত্র উদ্দেশ্য। সঞ্চিত ধন থাকিলে আল্লাহ্‌র যিকিরে ডুবিয়া থাকে, এমন লোকও আছেন। এই প্রকার

লোকের মন অতি উচ্চশ্রেণীর। অভাব মোচনের উপযোগী ধন না থাকিলে যাহাদের মন চঞ্চল থাকে, এমন কতক লোক আছে। তাহাদের পক্ষে শস্যক্ষেত্র রাখা উত্তম। কিন্তু জাঁকজমক ও শান-শওকত ব্যতীত যাহাদের মন আরাম পায় না, তাহারা দীনদার লোকের অন্তর্ভুক্ত নহে। আবার জাঁকজমক এবং শান-শওকতেরও কোন পরিসীমা নেই।

তৃতীয় মকাম–মানব জীবনে যে সকর বিপদাপদ ঘটা অবশ্যম্ভাবী বা প্রয়ই ঘটিয়া থাকে, উহা হইতে আত্মরক্ষা করার উপকরণ সংগ্রহ করিলে তাওয়াক্কুল নষ্ট হয় না। চোরে চুরি করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে দরজা বন্ধ করিয়া তালা লাগাইলে তাওয়াক্কুলের কোন ক্ষতি হয় না। শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিলেও তাওয়াক্কুল নষ্ট হয় না। এইরূপ শীত নিবারণের উদ্দেশ্যে শীতবস্ত্র পরিধান করিলে তাওয়াক্কুল বিনাশ পায় না। কিন্তু শীতকালে দেহের অভ্যন্তরীণ উষ্ণতা বৃদ্ধি করিয়া শীত দূর করিবার উদ্দেশ্যে উদর ভরিয়া আহার করিলে দাগ ও মন্ত্র ব্যবহারে যেমন তাওয়াক্কুল নষ্ট হয় তদ্রূপ উহাতেও নষ্ট হইয়া থাকে। তবে প্রকাশ্য কার্যকারণ পরিত্যাগ করা তাওয়াক্কুলের জন্য অপরিহার্য নহে। একদা এক পল্লীবাসী উষ্ট্রারোহণে আগমন করত উষ্ট্রটি ছাড়িয়া দিয়া রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল। তিনি পল্লীবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"তুমি উট কি করিলে?" পল্লীবাসী বলিল–"আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া উট ছাড়িয়া দিয়াছি।" তিনি বলিলেন–"উহাকে বাঁধিয়া রাখ এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর।"

মানব-প্রদত্ত দুঃখ–মানব-প্রদত্ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা এবং উহার প্রতিবিধান না করা তাওয়াক্কুলের অন্তর্গত; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَدَعْ اَذٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ -

অর্থাৎ "তাহাদের প্রদত্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া যাও এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর।" (সূরা আহ্‌যাব, ৬ রুকূ, ২২ পারা।) আল্লাহ্ অন্যত্র বলেনঃ

وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا - وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ -

অর্থাৎ "তোমরা আমাদিগকে যে কষ্ট দিতেছ, আমরা তাহা অবশ্যই সহ্য করিব এবং নির্ভরশীলদের উচিত যে, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে।" (সূরা ইবরাহীম, ৩ রুকূ, ১৩ পারা।) কিন্তু মনুষ্য ব্যতীত অপর জন্তু সাপ, বিচ্ছু

প্রভৃতি যন্ত্রণা দিলে সহ্য করা উচিত নহে; বরং উহা নিবারণ করা আবশ্যক। সুতরাং যে ব্যক্তি শত্রু হইতে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করে, অথচ সেই সময়ে নিজের বাহুবল ও অস্ত্রের উপর ভরসা না করিয়া কেবল আল্লাহর উপর নির্ভর করে, সে-ও আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীল। গৃহদ্বারে তালা লাগাইয়া তালার দৃঢ়তার উপর ভরসা না করিয়া কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করা আবশ্যক। কারণ, তালার দৃঢ়তা চোরকে প্রতিরোধ করে না।

তাওয়াক্কুলধারী লোকের নিদর্শন– চোরে গৃহ হইতে ধন লইয়া গেলে তাওয়াক্কুলধারী লোকের পক্ষে দুঃখিত হওয়া উচিত নহে; বরং আল্লাহ্‌র কার্যে সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক। গৃহদ্বারে তালা লাগাইয়া বাহির হওয়ার সময় অন্তরে বলা উচিত–"হে আল্লাহ, তোমার ইচ্ছা ও বিধান উলটাইবার উদ্দেশ্যে আমি গৃহদ্বারে তালা লাগাইতেছি না; বরং তোমার সৃষ্ট নিয়মের অনুসরণ করিতেছি মাত্র। তুমি যদি এই ধন লইয়া যাইবার জন্য কাহাকেও নিযুক্ত কর তবে আমি তোমার এই আদেশে সন্তুষ্ট আছি। কারণ, এই ধন অপর কাহারও ভোগের জন্য সৃষ্টি করিয়া তুমি ক্ষণিকের তরে আমার জিম্মায় রাখিয়াছ বা আমার জীবিকার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা আমি জানি না।" গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া বাহিরে যাইবার পর পুনরায় গৃহে ফিরিয়া যদি গৃহস্বামী দেখিতে পায় যে, তাহার ধন চুরি গিয়াছে এবং তজ্জন্য তাহার মনে দুঃখ হয় তবে তাহার জানা আবশ্যক যে, তাহার তাওয়াক্কুল ঠিক নহে এবং তাওয়াক্কুল করিয়াছে বলিয়া তাহার যে-ধারণা ছিল, ইহা নফসের ধোঁকামাত্র। এতদস্থলে চোরকে অপবাদ না দিয়া নীরব থাকিলে সে সবরের মর্যাদা পাইবে। কিন্তু চোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে এবং চোরকে ধরিবার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে সবরের মর্যাদা হইতেও সে বঞ্চিত থাকিবে। এমন লোকের পক্ষে জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, সে সবরকারী ও তাওয়াক্কুলধারী, এতদুভয়ের কোন দলে অন্তর্ভুক্ত নহে। এইরূপ দাবী তাহার পরিত্যাগ করা উচিত। এই চুরির কারণে তাহার এই উপকার হইল যে, সে বুঝিতে পারিল যে, তাহার সবর ও তাওয়াক্কুলের উক্ত দাবী ভ্রান্তিমূলক ছিল।

তাওয়াক্কুলের ভিত্তি–এ-স্থলে কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলিতে পারে যে, ধনের অভাবী না হইরে গৃহস্বামী ঘরের দরজা বন্ধ করিত না এবং ধনের হেফাযতও করিত না। এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তি নিজের অভাব মোচনের জন্য যে-ধন যত্ন করিয়া রাখিয়াছে, চোরে তাহা লইয়া গেলে সে দুঃখিত না হইয়া কিরূপে থাকিতে পারে? ইহার উত্তর এই—আল্লাহ্ মানবের সম্বন্ধে যাহা করেন তাহা

তাহার মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন। কিসে মানবের মঙ্গল নিহিত আছে, তাহা আল্লাহই ভাল জানেন, মানব কিছুই জানে না। এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলে ধন পাইয়া লোকে মনে করিবে, ইহাতেই তাহার মঙ্গল রহিয়াছে। কারণ, আল্লাহই তাহাকে ধন দান করিয়াছেন। আবার তাহার হস্ত হইতে ধন চলিয়া গেলে সে ধারণা করিবে, ইহাতেই তাহার মঙ্গল আছে; কেননা আল্লাহ্‌ই তাহার ধন তুলিয়া লইয়াছেন। এই বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে ধন থাকিলে বা অপহৃত হইলে, উভয় অবস্থায়ই মানব-মন প্রফুল্ল থাকে, কখনও দুঃখিত হয় না। বিষয়টি বুঝাইবার জন্য একটি উপমা দেওয়া হইতেছে। মনে কর, স্বয়ং দয়াময় পিতা এক পীড়িত বালকের চিকিৎসক। চিকিৎসক পিতা তাহাকে গোশ্‌ত আহার করিতে দিলে সে প্রফুল্ল চিত্তে বলে–'গোশ্‌ত আহারে আমার শরীর সুস্থ না হইলে তিনি কখনও আমাকে গোশ্‌ত খাইতে দিতেন না।' আবার তাহার হাত হইতে গোশ্‌ত কাড়িয়া লইলেও সে আনন্দিত হইয়া বলে–'গোশ্‌ত আহার আমার জন্য অনিষ্টকর না হইলে তিনি কখনই আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইতেন না।' ফলকথা এই–'আল্লাহ যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাকেন' এই বিশ্বাস যাহার হৃদয়ে মযবুত হয় নাই, সে তাওয়াক্কুল করিতে পারে না। এমন লোকের তাওয়াক্কুলের দাবী মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

তাওয়াক্কুলধারী ব্যক্তির কর্তব্য–ধন চুরি গেলে তাওয়াক্কুলধারী লোকের পক্ষে ছয়টি কর্তব্য পালন করা আবশ্যক।

প্রথম কর্তব্য–ধন নিরাপদে রাখিবার উদ্দেশ্যে দরজা বন্ধ করা উচিত বটে, কিন্তু বহু শিকল ও অনেক তালা লাগাইয়া বন্ধ করিতে বাড়াবাড়ি করা উচিত নহে এবং প্রতিবেশীদিগকে ধনের পাহারা দিতে অনুরোধ করাও উচিত নহে। বরং সহজভাবে দরজা বন্ধ করা আবশ্যক। হযরত মালিক ইবনে দীনার (র) দড়ি দিয়া দরজা বাঁধিয়া রাখিতেন এবং বলিতেন–"কুকুর প্রবেশের ভয় না থাকিলে রজ্জু দ্বারাও গৃহদ্বার বন্ধ করিতাম না।"

দ্বিতীয় কর্তব্য–যে-প্রকার ধন থাকিলে ধনের লোভে চোর নিশ্চয়ই গৃহে প্রবেশ করিবে বুঝা যায়, এমন ধন গৃহে রাখা উচিত নহে। এরূপ লোভনীয় দ্রব্য গৃহে রাখিয়া চোরকে ছুরি কার্যে উৎসাহ প্রদান করা হয়। আমীর মুগীরা একদা হযরত মালিক দীনারের (র) নিকট যাকাতের ধন প্রেরণ করিলেন। তিনি সমস্ত ধন ফিরাইয়া দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন–"তোমার ধন তুমি গ্রহণ কর। কারণ চোরে উহা লইয়া যাইবে বলিয়া শয়তান আমার মনে সন্দেহ জন্মাইতেছে।"

সন্দেহ দোলায় তাঁহার মন যেন বিচলিত না থাকে এবং কেহ চুরি করিয়া যাহাতে পাপে নিপতিত না হয়, এইজন্যই তিনি যাকাতের মাল ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। হযরত আবূ সুলায়মান দারানী (র) এই ঘটনা শুনিয়া বলিলেন–"ইহা সূফীদিগের চিত্তের দুর্বলতামাত্র। মালিক দীনার সম্পূর্ণ সংসারবিরাগী। চোরে ধন লইয়া যাইবে, ইহাতে তাঁহার কি?" হযরত আবূ সুলায়মান দারানীর (র) এই ধারণা তাওয়াক্কুলের পূর্ণতার নির্দশন।

তৃতীয় কর্তব্য–দরজা বন্ধ করিয়া বাহিরে যাইবার সময় এইরূপ নিয়ত করিবে–'আমার ধন-সম্পদ যদি চোরে লইয়া যায় তবে উহা তাহারই হইয়া যাউক এবং তাহার জন্য হালাল হউক।' এইরূপ নিয়ত করিলে তোমার ধন দ্বারা অভাবী চোরের অভাব মোচন হইবে অথবা সে ধনী হইয়া পড়িবে। ধনী হইলে সে অন্যের ধন চুরি করিবে না। সুতরাং অন্যান্য মুসলমানের ধনরক্ষার্থে তোমার এই অপহৃদ সম্পদ উৎসর্গীকৃত হইল। ইহাতে চোরের প্রতি যেমন সদয় ব্যবহার করা হইল তদ্রূপ সর্বসাধারণ মুসলমানের প্রতিও উদারতা করা হইল। আর তুমি জানিয়া রাখিবে, তোমার এইরূপ নিয়ত করার কারণে আল্লাহ্‌র কলম রদ হইবে না (অর্থাৎ চুরি না হওয়া যদি তাঁহার অভিপ্রায় হয় তবে কেহই চুরি করিবে না এবং চুরি করানোই যদি তাঁহার অভিপ্রায় থাকে তবে অবশ্যই চুরি হইবে।) উভয় অবস্থায়ই তুমি সদকার সওয়াব পাইবে। তুমি তোমার নিয়তের কল্যাণে এক দেরহামের পরিবর্তে সাত শত দেরহামের সওয়াব পাইবে। হাদিস শরীফে উক্ত আছে যে, স্ত্রীসহবাসকালে বীর্য বাহিরে নিক্ষেপ না করিয়া সন্তান উৎপাদনের নিয়তে জরায়ুতে নিক্ষেপ করিলে সন্তানের জন্ম হউক বা না হউক (উভয় অবস্থাতেই) তাহার ভাগ্যে এমন এক সুসন্তানের পুণ্য লিপিবদ্ধ হয়, যে সন্তান জিহাদ করিতে করিতে কাফিরের হস্তে শহীদ হয়। এইরূপ সওয়াব পাওয়ার কারণ এই যে, তাহার যে কর্তব্য ছিল, সে তাহা যথাযথভাবে সম্পাদন করিয়াছে। সন্তান জন্মানো ও তাহাকে জীবিত রাখা তাহার ক্ষমতাধীন নহে। যদি সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে উক্ত সন্তানের পাপ-পুণ্য তাহার কর্ম অনুযায়ী হইয়া থাকে (ইহাতে পিতার জন্য বর্ণিত সওয়াবের মধ্যে কোন ত্রুটি আসিবে না।)

চতুর্থ কর্তব্য–ধন অপহৃত হইলে দুঃখিত হওয়া উচতি নহে এবং মনে করা উচিত যে, চুরি হওয়াতেই মঙ্গল রহিয়াছে। ধন চুরি গেলে যদি বলা হয়–'উহা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিলাম,' তবে অপহৃত ধনের অনুসন্ধান করা উচিত নহে। এমন

কি চোরে ফিরাইয়া দিলেও উহা গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। তবে গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই; কেননা উহা তাহারই ধন। কিন্তু তাওয়াক্কুলধারী ব্যক্তির পক্ষে ইহা শোভা পায় না। হযরত ইব্‌নে ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর একটি উট চুরি হইয়া যায়। তিনি ইহা অনুসন্ধান করিতে করিতে হয়রান হইয়া পড়েন। তখন তিনি বলিলেন–"ইহা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিলাম।" এই বলিয়া তিনি মসজিদে গমনপূর্বক নামাযে প্রবৃত্ত হইলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া জানাইল–"উটটি অমুক স্থানে আছে।" তিনি উটের অনুসন্ধানে বাহির হইবার জন্য পাদুকা পরিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি 'আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ্' বলিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন–"উষ্ট্রটি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দেওয়া হইয়াছে। এখন ইহার ত্রিসীমায়ও যাইব না।"

এক বুযুর্গ স্বপ্নে জনৈক মুসলমানকে বেহেশতে দুঃখিত দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই ব্যক্তি বলিল–"আমার এ-দুঃখ কিয়ামত পর্যন্ত থাকিবে। কারণ, ইল্লীনে বহু উৎকৃষ্ট স্থান আমাকে দেখানো হইয়াছে, এমন স্থান সমস্ত বেহেশ্‌তে আর নাই আমি আনন্দিত হইয়া ঐ দিকে যাইতেছিলাম। এমন সময় আওয়ায আসিল–'এই ব্যক্তিকে দূর করিয়া দাও। কারণ যাহারা আল্লাহ্‌র পন্থা জারি রাখিয়াছে, তাহাদের জন্য এই সকল উৎকৃষ্ট স্থান।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম–আল্লাহ্‌র পন্থা জারি রাখার অর্থ কি?" উত্তর হইল–'তুমি একদা বলিয়াছিলে–অমুক বস্তু আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিলাম। কিন্তু তৎপর ইহা পালন কর নাই। তুমি নিজ উক্তি পূর্ণ করিলে তোমাকে ঐ উৎকৃষ্ট স্থান দেওয়া হইত।' এক ব্যক্তি মক্কা শরীফে নিদ্রিত ছিল। সে জাগ্রত হইয়া দেখিল যে, তাহার টাকার থলিয়াটি চুরি গিয়াছে। এক বুযুর্গ আবিদ তথায় ছিলেন। সেই ব্যক্তি আবিদের প্রতি চুরির দোষারোপ করিল। আবিদ তাহাকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"তোমার থলিয়াতে কত টাকা ছিল?" সেই ব্যক্তি যত টাকার কথা বলিল আবিদ তাহাকে তত টাকা দিয়া দিলেন। সে টাকাগুলি লইয়া বাহির হইয়া শুনিতে পাইল যে, তাহা কোন বন্ধু কৌতুকস্বরূপ থলিয়াটি তুলিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ সে আবিদের নিকট ফিরিয়া গেল এবং টাকাগুলি ফেরত লইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিল; কিন্তু আবিদ তাহা গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন–"আমি স্বেচ্ছায় এই টাকাগুলি আল্লাহ্‌র পথে দিয়াছি।" অবশেষে নিতান্ত পীড়াপীড়িতে পড়িয়া তিনি বলিলেন–"আচ্ছা টাকাগুলি দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।" তৎপর সমুদয় টাকা দরিদ্রের মধ্যে

বিতরণ করিয়া দেওয়া হইল। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের আচরণ এইরূপই ছিল। উদাহারণস্বরূপ মনে কর, ফকীরকে দেওয়ার জন্য খাদ্যদ্রব্য লইয়া গিয়া যদি দেখা যাইত যে, ফকীর চলিয়া গিয়াছে তবে সেই দ্রব্য ফিরাইয়া আনিয়া আহার করাকে তাঁহার মকরূহ জানিতেন এবং অপর ফকীরকে উহা দিয়া দিতেন।

পঞ্চম কর্তব্য– চোরের জন্য বদ দু'আ করা উচিত নহে। ইহাতে তাওয়াক্কুল ও পার্থিব সম্পদে অনাসক্তি উভয়ই নষ্ট হয়। কারণ যে ক্ষতি হইয়া গিয়াছে তজ্জন্য যে ব্যক্তি অনুশোচনা করে, সে সংসারবিরাগী নহে। হযরত রবী' ইব্নে খসীমের (র) কয়েক সহস্র দেরহাম মূল্যের একটি অশ্ব চোরে লইয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, চোরে লইয়া যাইবার সময় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনি চোরকে ঘোড়া লইয়া যাইতে দিলেন কেন?" তিনি বলিলেন–"আমি যে কার্যে রত ছিলাম উহা আমার নিকট ঘোড়া অপেক্ষা অধিক প্রিয়।" অর্থাৎ তিনি তখন নামাযে ছিলেন। লোকে সেই সময় চোরকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন–"অভিসম্পাত করিও না। আমি ঘোড়াটি সদ্‌কা দিয়া তাহার জন্য হালাল করিয়া দিয়াছি।" লোকে এক বুযুর্গকে তাঁহার অত্যাচারীর প্রতি অভিসম্পাত দিতে অনুরোধ করে। তিনি বলিলেন–"সে নিজের উপর অত্যাচার করিয়াছে; আমার উপর করে নাই। তাহার নিজের দুষ্কর্ম তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবে। তাহার উপর আমি আর অতিরিক্ত শাস্তি চাপাইতে পারি না।" হাদীস শরীফে আছে যে বান্দা স্বীয় অত্যাচারীর উপর অভিসম্পাত দেয় এবং তাহাকে মন্দ বলে। এইরূপে সে পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করে। এমনও হয় যে, (অতিরিক্ত অভিসম্পাদ ও গালিগালাজের দরুন) উল্টা অত্যাচারিতের উপর অত্যাচারীর হক থাকিয়া যায়।

ষষ্ঠ কর্তব্য–চোর যে পাপ করিয়া শাস্তির যোগ্য হইয়াছে তজ্জন্য তৎপ্রতি দয়া প্রদর্শনার্থ দুঃখিত হওয়া উচিত। ধনস্বামী অত্যাচারিত হইয়াছে, অত্যাচার করে নাই এবং তাহার ধনের ক্ষতি হইয়াছে, ধর্মের ক্ষতি হয় নাই বলিয়া আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দেওয়া কর্তব্য। কারণ যে-ব্যক্তি গোনাহ্‌কে হালাল মনে করে তৎপ্রতি তাহার মনে দয়ার সঞ্চার হয়, মানব জাতির প্রতি তাহার ভালবাসা নাই। হযরত ফুযায়ল (র) তদীয় পুত্র হযরত আলীকে (র) স্বীয় ধন চোরে লইয়া যাওয়াতে রোদন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"তুমি ধন চুরি হইয়াছে বলিয়া রোদন করিতেছ?" পুত্র বলিলেন–"না, আমি সেই চোর

বেচারার দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া রোদন করিতেছি। বেচারা এমন দুষ্কর্ম করিয়াছে যে, কিয়ামত দিবস তাহার কোনও ওজর-আপত্তি করিবার পথ থাকিবে না।"

চতুর্থ মকাম–রোগের চিকিৎসা ও আগত বিপদাপদ দূরীকরণ সম্বন্ধে এ-স্থলে বর্ণিত হইতেছে। চিকিৎসার তিনটি শ্রেণী আছে। **প্রথম শ্রেণী**–যাহাতে সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত, যেমন অন্ন ক্ষুধা দূর করে, পানি পিপাসা নিবারণ করে এবং কোথাও আগুন লাগিলে পানি ঢালিয়া দিলে অগ্নি নির্বাপিত হয়। এবংবিধ প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন না করা তাওয়াক্কুল নহে; বরং উহা বর্জন করা হারাম। **দ্বিতীয় শ্রেণী**–যে ব্যবস্থায় সুফল প্রাপ্তি নিশ্চিত নহে, আবার কল্পিতও নহে, বরং সুফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে; যথা–'মন্ত্র', 'দাগ' ও 'ফাল'। এই সকল বর্জন করা তাওয়াক্কুলের অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শরীফে আছে যে, এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করা বাহ্য উপকরণে বাড়াবাড়ি ও উহার উপর নির্ভরশীলতার নিদর্শন। ইহাদের মধ্যে 'দাগ' নিকৃষ্টতম। ইহার পরে মন্ত্র ও সর্বশেষে ফাল। **তৃতীয় শ্রেণী**–ইহা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যবর্তী, প্রথম শ্রেণীর ন্যায় নিশ্চিত নহে, আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর ন্যায় অযৌক্তিক এবং অনিশ্চিত নহে। শিঙ্গা লাগাইয়া রক্ত বাহির করা, জোলাপ লওয়া, শীত লাগিলে উষ্ণ দ্রব্য ব্যবহার আবার তৃষ্ণা বোধ হইলে শীতল দ্রব্য গ্রহণ, এই শ্রেণীর চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত। এইগুলি বর্জন হারাম নহে, আবার তাওয়াক্কুলের জন্য অপরিহার্য নহে। কখন কখন এইরূপ পদার্থ ব্যবহার করা, না করা অপেক্ষা উত্তম। আবার কোন সময় ব্যবহার না করাই উত্তম। এই সকল পরিত্যাগ করা তাওয়াক্কুলের জন্য অপরিহার্য নহে। ইহার প্রমাণ এই যে, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই শ্রেণীর দ্রব্য ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং নিজেও ব্যবহার করিয়াছেন।

তিনি বলেন–"হে আল্লাহ্‌র বান্দা, তোমরা ঔষধ ব্যবহার কর।" তিনি বলেন–"মৃত্যু ব্যতীত অপর সকল রোগের ঔষধ আছে; তবে মানুষ কোন সময় সেই ঔষধ জানে, আবার কোন সময় জানে না।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, ঔষধ এবং মন্ত্র কি আল্লাহ্‌র বিধান উলটাইয়া দিতে পারে?" তিনি বলেন–"ইহাও যে আল্লাহ্‌রই বিধান।" তিনি বলেন–"আমি ফিরিশতাগণের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় তাঁহাদের প্রত্যেক দল আমাকে বলিতেন 'আপনি আপনার উম্মতকে শিঙ্গা লাগাইয়া রক্ত বাহির করিতে উপদেশ

দিবেন।" তিনি বলেন- "(চান্দ্র) মাসের ১৭ই, ১৯শে এবং ২১ শে তারিখ শিঙ্গা লাগাইয়া রক্ত বাহির কর। অন্যথায় রক্তাধিক্য তোমাকে বিনাশ করিতে পারে।" তিনি অন্যত্র বলেন-"আল্লাহ্‌র আদেশে রক্তই বিনাশের কারণ হয়।" শরীর হইতে রক্ত বাহির করা, পরিহিত বস্ত্র হইতে সাপ ঝাড়িয়া ফেলা এবং গৃহে লাগানো অগ্নি নির্বাপণ করা সমান। কেননা এই সকল বিনাশের কারণ হইয়া থাকে এবং এইগুলি না করা তাওয়াক্কুলের জন্য অপরিহার্য নহে। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন-"মাসের ১৭ই তারিখ মঙ্গলবারে শিঙ্গা লাগইলে সারা বৎসর শরীরে রোগ থাকে না।" তিনি হযরত সা'আদ ইবনে মু'আয রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে শিঙ্গা লাগাইতে আদেশ দিয়াছিলেন। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর চক্ষে বেদনা ছিল। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে তাজা খেজুর খাইতে নিষেধ করিলেন এবং বিটচিনিসহ এক প্রকার পাতা ও যবের আটা পাক করিয়া খাইতে আদেশ করিলেন। তিনি হযরত সুহব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলিলেন-"তোমার চক্ষে ব্যথা, অথচ খোরমা খাইতেছ?" তিনি কৌতুকরূপ নিবেদন করিলেন-"হে আল্লাহর রাসূল, যে চক্ষে ব্যথা হইয়াছে ইহার বিপরীত দিকের মাড়ী দ্বারা চিবাইয়া খাইতেছি।" উত্তর শুনিয়া হযরত (সা) হাসিয়া ফেলিলেন।

ঔষধ ব্যবহার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা) আচরণ- রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রত্যহ রজনীতে চক্ষে সুরমা লাগাইতেন। প্রতি মাসে শিঙ্গা লাগাইতেন এবং প্রতি বৎসর ঔষধ সেবন করিতেন। ওহী নাযিলের সময় তাঁহার পবিত্র মস্তকে বেদনা হইত; তিনি বেদনাস্থলে মেহদী লাগাইতেন। শরীরের কোন স্থানে ক্ষত হইলে তথায়ও তিনি মেহদী প্রয়োগ করিতেন এবং অধিকাংশ সময় ক্ষতস্থানে মৃত্তিকাচূর্ণ প্রক্ষেপ করিতেন। রোগের সময় রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে সকল ঔষধ স্বয়ং ব্যবহার করিয়াছেন এবং অপরকে ব্যবহার করিতে আদেশ দিয়াছেন তৎসমুদয় সংগ্রহ করত আলিমগণ 'তিব্বুন্ নবী' নামক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ঔষধ ব্যবহার সম্বন্ধে হযরত মূসার (আ) উপর ওহী-হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম একবার পীড়িত হইলেন। বনী ইস্‌রাঈলের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিলেন-"অমুক দ্রব্য এই রোগের ঔষধ।" তিনি বলিলেন-"আমি ঔষধ সেবন করিব না; স্বয়ং আল্লাহই আমাকে নিরাময় করিবেন।" তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পাইল। লোকে বলিল-"ইহার ওষধ বিখ্যাত এবং অব্যর্থ। ইহা ব্যবহারমাত্র

লোক আরোগ্য লাভ করে।" তিনি ঔষধ সেবন করিতে সম্মত হইলেন না এবং পীড়াও দূর হইল না। তখন ওহী নাযিল হইল-"হে মূসা, আমি স্বীয় গৌরবের শপথ করিয়া বলিতেছি-তুমি যে পর্যন্ত ঔষধ সেবন না করিবে, সেই পর্যন্ত আমি তোমাকে নিরাময় করিব না।" অবশেষে তিনি ঔষধ সেবন করিয়া আরোগ্য লাভ করিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার মনে কিছু খটকা ছিল। তখন ওহী আসিল-"হে মূসা, তুমি কি তোমার তাওয়াক্কুল দ্বারা আমার হেকমত বাতিল করিয়া দিতে চাও? আমা ব্যতীত অপর কে ঔষধের মধ্যে উপকারিতা রাখিয়া দিয়াছে?"

এক নবী (আ) শারীরিক দুর্বলতার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট অভিযোগ করিলেন। ওহী আসিল-"গোশত আহার কর এবং দুধ পান কর।" এক কওম সমসাময়িক পয়গম্বরের নিকট তাহাদের সম্প্রদায়ে সুশ্রী সন্তান জন্ম গ্রহণ করে না বলিয়া অভিযোগ করিলে ওহী আসিল-"সেই সম্প্রদায়ের নারীদিগকে গর্ভাবস্থায় টাট্‌কা খাদ্য আহার করিতে বলিয়া দাও। তাহা হইলে তাহাদের সন্তান সুশ্রী হইবে।" তৎপর সেই কওমের নারীগণ গর্ভাবস্থায় এবং নেফাসের সময়ে টাটকা খাদ্য ভক্ষণ করিতে লাগিল।

উপরিউক্তি বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, উৎকৃষ্ট পানাহার যেমন পরিতৃপ্তি দান করে তদ্রূপ ঔষধ স্বাস্থ্য প্রদান করে। তবে এই সমস্ত একমাত্র বিশ্বকারণ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট হিতকর কৌশলেই হইয়া থাকে। হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম নিবেদন করিলেন-"ইয়া আল্লাহ্, রোগ কি কারণে হয় এবং আরোগ্যই বা কি কারণে ঘটে?" উত্তর আসিল-"উভয়েই আমার আদেশে ঘটে।" হযরত মূসা (আ) পুনরায় নিবেদন করিলেন-"তাহা হইরে চিকিৎসক কি কার্যে আসে?" উত্তর হইল-"চিকিৎসক ঔষধের উপলক্ষে জীবিকা পাইবে এবং আমার বান্দাদিগকে প্রফুল্ল রাখিবে।"

ফলকথা এই যে, চিকিৎসাক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল জ্ঞানমূলক ও মনের ভাবমূলক ব্যাপার। ঔষধের উপর ভরসা না করিয়া ঔষধের সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা করা মানুষের উচিত। কারণ বহু লোক ঔষধ সেবন করিয়াও মরিতেছে।

দাগ লওয়া অনুচিত কেন-রোগ দূর করিবার নিমিত্ত উত্তপ্ত লৌহের দাগ লওয়ার অভ্যাস বহু লোকের আছে। কিন্তু দাগ লইলে তাওয়াক্কুলের শ্রেণী হইতে লোক বহির্গত হইয়া পড়ে। বরং দাগ লওয়া শরীয়তে নিষিদ্ধ হইয়াছে;

কিন্তু ঝাড়ফুঁক নিষিদ্ধ হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, আগুন দ্বারা পোড়াইয়া দাগ দিলে ক্ষত ভয়ানক আকার ধারণ করিতে পারে এবং শরীরের সর্বস্থানে আগুনের তাপ পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ার আশংকা থাকে। দাগ লওয়া শিঙ্গা লাগাইয়া রক্ত বাহির করার সমতুল নহে। আর দাগ লওয়ার উপকারও শিঙ্গা লাগানোর উপকারের ন্যায় নহে। তদুপরি দাগের পরিবর্তে অন্য ঔষধও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

হযরত ওমর ইব্নে হুসায়ন (র) পীড়িত হইয়াছেন। লোকে তাঁহাকে দাগ লইতে অনুরোধ করিল; কিন্তু তৎপ্রতি তিনি কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে সকলের পীড়াপীড়িতে তিনি দাগ লইতে বাধ্য হইলেন। তৎপর তিনি বলেন–"পূর্বে আমি এক নূর দেখিতে পাইতাম, আকাশ-বাণী শুনিতাম এবং ফিরিশতাগণ 'আসসালামু আলায়কুম' বলিয়া আমাকে অভিনন্দন করিত। কিন্তু দাগ লওয়ার পর এই সমস্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তৎপর আমি তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।" হযরত মুতার্‌রাফ ইব্নে আবদুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হুর নিকট তিনি ইহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, বহুদিন পর আল্লাহ্ তাঁহাকে পূর্বাবস্থা পুনরায় প্রদান করিয়াছেন।

অবস্থা বিশেষে ঔষধ ব্যবহারে বিরতি সুন্নত-বিরোধিতা নহে; বরং কোন কোন স্থলে ঔষধ সেবন না করা উত্তম—অধিকাংশ বুযুর্গ ঔষধ ব্যবহার করেন নাই। এ-কথা শুনিয়া কেহ হয়ত প্রতিবাদ করিয়া বলিতে পারে যে, ঔষধ ব্যবহারে বিরত থাকা সর্বোৎকৃষ্ট হইলে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কখনও ঔষধ ব্যবহার করিতেন না। এই প্রতিবাদ টিকিবে না। কারণ, ছয়টি কারণে লোকে ঔষধ ব্যবহারে বিরত থাকে। যথাঃ–**প্রথম কারণ**–যে-সকল কামিল লোকে কাশ্‌ফ দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহাদের মৃত্যু অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাঁহারা আর ঔষধ সেবন করিতে চাহেন না। এইজন্যই হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু অন্তিম পীড়ায় আক্রান্ত হইলে লোকেরা চিকিৎসক ডাকিবার অনুমতি চাহিলেন; কিন্তু তিনি বলিলেন– "চিকিৎসক আমাকে দেখিয়া বলিয়াছেন – اِنِّىْ اَفْعَلُ مَا اُرِيْدُ অর্থাৎ আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করি।" [আল্লাহ্‌র দিকে লক্ষ্য করিয়াই হযরত আবূ বকর (রা) এই কথা বলিয়াছিলেন।] **দ্বিতীয় কারণ**–পীড়িত ব্যক্তি পরকালের চিন্তায় লিপ্ত থাকিলে তাহার মনে চিকিৎসার খেয়ালও উদিত হয় না। যেমন, হযরত আবূ দরদা

রাযিয়াল্লাহু আন্হু পীড়িত অবস্থায় রোদন করিতেছিলেন। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"আপনি রোদন করিতেছেন কেন?" তিনি উত্তর দিলেন–"পাপের কারণে।" তাঁহারা বলিলেন–"আপনি কিসের আশা রাখেন?" তিনি বলিলেন–"আল্লাহ্‌র রহমতের।" তাঁহারা বলিলেন–"চিকিৎসক ডাকা হইবে কি?" তিনি বলিলেন–"চিকিৎসকই (অর্থাৎ আল্লাহ) আমাকে পীড়িত করিয়াছেন।" হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আন্হুর চক্ষে বেদনা ছিল। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"আপনি ঔষধ ব্যবহার করেন না কেন?" তিনি বলিলেন–"আমি ঔষধ ব্যবহার অপেক্ষা বড় কাজে লিপ্ত আছি।" এই কথা বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইতেছে। মনে কর, কোন ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদানের জন্য বাদশাহ্‌র নিকট লইয়া যাওয়া হইতেছে। এমতাবস্থায় কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল–"তুমি আহার করিতেছ না কেন?" তখন সে বলিল "ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য আমি উদ্বিগ্ন নহি।" এই কথা বলাতে আহার গ্রহণকারীর প্রতি তিরস্কার করা হয় না এবং তাহার বিরুদ্ধাচরণও করা হয় না। পরকালের চিন্তায় মগ্ন লোকের অবস্থা হযরত সহলের (র) ন্যায় হইয়া থাকে। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল–"আহার কি?" তিনি বলিলেন–"আল্লাহ্‌র যিকির।" তাহারা বলিল–"আমরা জীবন ধারণের উপকরণ সম্বন্ধে জানিতে চাহিতেছি।" তিনি উত্তর দিলেন–"ইহা ইলম।" তাহারা বলিল–"আমরা খাদ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি।" তিনি বলিলেন–"ইহা আল্লাহ্‌র যিকির।" তাহারা অবশেষে বলিল"আমরা শরীর পোষক খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে জানিতে চাহিতেছি।" তিনি বলিলেন– "শরীরের চিন্তায় মগ্ন না হইয়া ইহাকে সৃষ্টিকর্তার উপর ছাড়িয়া দাও।" **তৃতীয় কারণ**–চিররোগী হওয়া। যে-ব্যক্তি দীর্ঘকাল যাবত রোগে ভুগিতেছে, বহু ঔষধ ব্যবহার করিয়াও কোন ফল না পাইয়া ঔষধকে মন্ত্রতন্ত্রের ন্যায় অকর্মণ্য বলিয়া মনে করিতেছে, তদ্রূপ ব্যক্তি পরিশেষে ঔষধ ব্যবহারে বিরত থাকে। যাহারা চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ নহে, তাহারা অধিকাংশ ঔষধকে এইরূপ অকর্মণ্য বলিয়াই মনে করে। হযরত রবী' ইব্নে খসীম (র) বলেন– "রোগ হইলে চিকিৎসা করিতে আমার ইচ্ছা হয়। কিন্তু পরক্ষণেই আদ ও সামূদ প্রভৃতি যে সকল জাতি কালের গর্ভে বিলীন হইয়াছে, তাহাদের কথা স্মরণ হয়। তাহাদের মধ্যে বহু অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন, তথাপি তাহারা মরিয়া গিয়াছে। চিকিৎসা বিদ্যা তাহাদের কোন উপকার করিতে পারে নাই।' ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি ঔষধকে স্বাস্থ্য লাভের বাহ্য উপকরণ বলিয়াও মনে করিতেন না।

চতুর্থ কারণ–রোগের কারণে যে-সওয়াব পাওয়া যায়, ইহা লাভের আশায় রোগী রোগমুক্তি কামনা করে না; বরং রুগ্ন অবস্থায় থাকিয়া নিজের সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিতে চাহে। কারণ হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, স্বর্ণকার অগ্নি দ্বারা পোড়াইয়া যেরূপ স্বর্ণের পরীক্ষা করে, আল্লাহর তদ্রূপ বিপদাপদ দ্বারা তাঁহার বান্দাগণকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। পরীক্ষায় কোন স্বর্ণ খাঁটি বলিয়া প্রমাণিত হয় আবার কোনটি অখাঁটি বলিয়া ধরা পড়ে। হযরত সহল তস্তরী (র) অপর লোককে ঔষধ সেবনের আদেশ দিতেন। কিন্তু তাঁহার নিজের এক পীড়া ছিল; তিনি ইহার জন্য ঔষধ ব্যবহার করিতেন না এবং বলিতেন–"রোগযন্ত্রণা সন্তোষের সহিত সহ্য করিয়া বসিয়া বসিয়া নামায পড়াকে আমি সুস্থ শরীরে দাঁড়াইয়া নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম বলিয়া জানি।" **পঞ্চম কারণ**–যে-রোগী বহু পাপ করিয়াছেন এবং আশা করে যে, রোগ এই সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যাইবে, এমন ব্যক্তি ঔষধ সেবনে ক্ষান্ত থাকে। কারণ, হাদীস শরীফে উক্ত আছে যে, পাপ হইতে মুক্ত করিবার জন্য বান্দাকে জ্বররোগে আক্রান্ত করা হয়। জ্বরের তাপে পাপ এমনভাবে পরিষ্কার হইয়া যায়, যেমন বরফ হইতে ধূলাবালি দূর হইয়া থাকে। হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম বলেন–"যে-ব্যক্তি পাপ মুক্তির আশায় সন্তুষ্ট চিত্তে দৈহিক পীড়া ও আর্থিক বিপদ সহ্য না করে, সে আলিম নহে।" হযরত মূসা আলায়হিস সালাম এক রোগীকে দেখিয়া নিবেদন করিলেন–"ইয়া আল্লাহ, তাহার উপর দয়া কর।" প্রত্যাদেশ হইল–"আর কিরূপে তাহার উপর দয়া করিব? আমি ত এই রোগ দিয়া তাহার পাপ দূর করিয়া দিতেছি এবং তাহাকে আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রদান করিতেছি।" **ষষ্ঠ কারণ**–যে-ব্যক্তি ভালরূপে বুঝিতে পারিয়াছে যে, শরীর সুস্থ থাকিলে মানুষ গর্বিত ও অবাধ্য হইয়া পড়ে এবং ইবাদত কার্যে অলসতা আসে, সে সর্বদা পীড়িত থাকিতেই পছন্দ করে যেন সে পরকালের কার্যে গাফিল না হইয়া পড়ে। আল্লাহ্ যাহার মঙ্গল কামনা করেন, তাহাকে রোগশোক দ্বারা সর্বদা পরকালের জন্য সতর্ক রাখেন। এইজন্যই বুযুর্গগণ বলিয়াছেন–"অভাব, রোগ ও লাঞ্ছনা হইতে মুসলমান কখনও মুক্ত থাকে না।" হাদীস শরীফে আছে যে, আল্লাহ্ বলেন–"রোগ আমার শৃঙ্খল এবং দরিদ্রতা আমার জেলখানা। আমি যাহাকে ভালবাসি তাহাকেই আমি আমার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করত আমার জেলখানায় আটকাইয়া রাখি।" অতএব অটুট স্বাস্থ্য পাপের দিকে আকর্ষণ করে বলিয়া রোগের মধ্যেই মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু এক

দল লোককে বেশভূষায় সজ্জিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"ইহা কি?' লোকে বলিল–"অদ্য তাহাদের ঈদের দিন।" তিনি বলিলেন–"যে দিন পাপকার্য করা না হয়, তাহাই আমাদের ঈদের দিন।" এক বুযুর্গ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞসা করিলেন–"কেমন আছ?" সেই ব্যক্তি বলিল–"ভাল আছি।" তিনি বলিলেন–"যে দিন পাপ না কর, বাস্তবিকই সেইদিন তুমি ভাল থাক। কিন্তু যদি পাপ কর তবে ইহা অপেক্ষা গুরুতর পীড়া আর কি আছে?' বুযুর্গগণ বলেন–"ফিরআউন চারিশত বৎসর জীবিত ছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাহার কোন সময় মাথা-বেদনা এবং জ্বরও হয় নাই। এইজন্যই সে নিজেকে খোদা বলিয়া দাবী করিয়াছিল। তাহার মাথায় যদি ঘণ্টাকাল আধ-কপালী বেদনাও থাকিত তবে সে কখনই তদ্রূপ মিথ্যা দাবী করিত না।" তাঁহারা অন্যত্র বলেন–"বান্দা এক দিনের জন্য পীড়িত হইয়াও যদি তওবা না করে তবে মওতের ফিরিশ্তা হযরত আযরাঈল আলায়হিস্ সালাম বলেন–'হে গাফিল আমি কয়েকবার তোমার নিকট আমার দূত পাঠাইয়াছিল; তথাপি তোমার কোন উপকারই হইল না।" তাঁহারা আরও বলেন–"বিশ্বাসী মুসলমানের পক্ষে চল্লিশ দিন ধরিয়া দুঃখ রোগ, ভয় বা ক্ষতি হইতে মুক্ত থাকা উচিত নহে।"

রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক নারীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিল। লোকে সেই নারীর প্রশংসাস্থলে বলিল–"হে আল্লাহ্র রাসূল, সে কখনও পীড়িত হয় না।" তিনি বলিলেন–'তাহা হইলে তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা আমার নাই।" একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কথা প্রসঙ্গে শিরঃপীড়া সম্বন্ধে বলিতে ছিলেন। এমন সময় এক পল্লীবাসী আরবী বলিল–"শিরঃপীড়া আবার কি? আমার ত কখনও রোগই হয় না।" তিনি বলিলেন–"আমার নিকট হইতে দূর হও। কেহ দোযখী লোক দেখিতে চাহিলে তাহাকে বলিয়া দাও, সে যেন এই পল্লীবাসী আরবীকে দেখিয়া লয়।" হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হা নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্র রাসূল, কেহ কি শহীদের মরতবা লাভ করিতে পারে?" হযরত (সা) বলিলেন–"হাঁ, যে-ব্যক্তি দিবারাত্রে বিশবার মৃত্যুকে স্মরণ করে, সে (শহীদের মরতবা) পাইতে পারে।" পীড়িত ব্যক্তি সমস্ত দিনে বিশবারেরই অধিক মৃত্যু-চিন্তা করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সকল কারণেই কতক লোক ঔষধ ব্যবহারে বিরত রহিয়াছেন। কিন্তু উপরিউক্ত ফল লাভের উদ্দেশ্যে শরীরে রোগ পুষিয়া রাখিবার আবশ্যকতা রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের

ছিল না এবং এইজন্যই তিনি ঔষধ ব্যবহার করিয়াছিলেন। ফলকথা এই যে, বাহ্য উপায়-উপকরণ পরিত্যাগ করা তাওয়াক্কুলের বিরোধী নহে।

মহামারীর স্থানে গমন বা তথা হইতে পলায়ন অনুচিত – হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু এক সময়ে শাম দেশে যাইতেছিলেন। পথে সংবাদ পাইলেন যে, তথায় মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সঙ্গীদের কেহ কেহ যাইতে অসম্মত হইলেন; আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন–"আমরা আল্লাহ্র বিধান হইতে পলাইব না।" হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–"আমরা আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধি হইতে তাঁহার বিধির দিকেই দ্রুত অগ্রসর হইব।" তৎপর তিনি বলিলেন–"তোমাদের মধ্যে কাহারও যদি দুইটি মাঠ থাকে–তন্মধ্যে একটি শ্যামল-শষ্য পরিপূর্ণ, অপরটি তৃণলতাশূন্য শুষ্ক ভূমি, তবে এমন স্থলে যে মাঠে রাখাল ছাগ চরাইতে যায় তাহা আল্লাহর নির্ধারিত বিধিলিপির আন্তর্গত।" অবশেষে হযরত ওমর (রা) হযরত আবদুর রহমান ইব্নে আওফ রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে আহবান করিয়া এই বিষয়ে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন–"আমি রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে শুনিয়াছি –'যদি তোমরা শুনিতে পাও যে, অমুক স্থানে মহামারী লাগিয়াছে তবে তথায় যাইবে না। আর তোমরা যে স্থানে আছ তথায় মহামারী থাকিলে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিও না।" ইহা শুনিয়া হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলিলেন–"আল্হামদুলিল্লাহু, আমার অভিমত হাদীসানুরূপ হইয়াছে। তৎপর অপর সাহাবাগণও এই বিষয়ে একমত হইয়াছিলেন।

মহামারীর স্থান হইতে পলায়ন নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ–দ্বিবিধ কারণে মহামারীর স্থান হইতে পলায়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রথম কারণ–সুস্থ লোক তথা হইতে চলিয়া গেলে সেবা-শুশ্রূষার অভাবে পীড়িত লোকের দুরবস্থা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় কারণ-মহামারীর স্থানের আবহাওয়া যখন সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করিয়াছে তখন অন্যত্র চলিয়া যাওয়াও বৃথা। কোন কোন হাদীসে বর্ণিত আছে যে, জিহাদের ময়দান হইতে কাফিরের ভয়ে পলায়ন করা এবং মহামারীর স্থান হইতে পলায়ন করা, এই উভয়ই সমান কথা। এই সমতার কারণ এই যে, জিহাদের ময়দান হইতে পলায়ন করিলে অবশিষ্ট যোদ্ধাগণের ও আহত সৈন্যদের যেরূপ মন ভাঙ্গিয়া যায় তদ্রূপ মহামারীর স্থান হইতে সুস্থ লোক চলিয়া গেলে পীড়িতদের হতাশা বৃদ্ধি পায়। তদুপরি পীড়িতদিগকে পথ্য দিবার ও তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিবার কেহই থাকে না। এমতাবস্থায় তাহারা

বিনাশপ্রাপ্ত হয়! অপর পক্ষে মহামারীর স্থান হইতে পলাইয়া রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়াও সন্দেহজনক।

রোগ প্রকাশ করা কখন সঙ্গত–রোগ প্রকাশ না করাই তাওয়াক্কুলের জন্য অপরিহার্য এবং প্রকাশ ও অভিযোগ করা মাকরূহ। কিছু যুক্তিসঙ্গত কারণে প্রকাশ করা মাকরূহ নহে, যেমন চিকিৎসকের নিকট নিজের রোগের বিষয় বর্ণনা করা অথবা মন হইতে ঔদ্ধত্য ও বাহাদুরির ভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় দুর্বলতা প্রকাশ করা। ইহার প্রমাণ এই–হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্হু পীড়িত ছিলেন। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনি ভাল আছেন ত?" তিনি বলিলেন–"না।" ইহা শ্রবণে পার্শ্ববর্তী লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হইয়া একে অপরের দিকে চাহিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তিনি বলিলেন–"আল্লাহ্র সহিতও কি বাহাদুরি দেখাইব?" জগত-বিখ্যাত বীর ও এত বড় বুযুর্গ হওয়া সত্ত্বেও নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষেই শোভা পায়। এইজন্যই তিনি দু'আ করিতেন–"হে আল্লাহ্, আমাকে সবর দান কর।" আর রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্র নিকট মঙ্গল ও স্বাস্থ্য প্রার্থনা কর, বিপদাপদ চাহিও না।"

ফলকথা এই যে, সঙ্গত কারণ থাকিলেও অভিযোগের সুরে রোগের কথা প্রকাশ করা হারাম। অভিযোগ প্রকাশ না পাইলে রোগের কথা প্রকাশ দুরস্ত আছে; কিন্তু প্রকাশ না করাই উত্তম। কারণ, হয়ত রোগের বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইয়া পড়িবে এবং অপর লোকে ইহাকে অভিযোগ প্রকাশ বলিয়া মনে করিতে পারে। আলিমগণ বলেন–"পীড়িত হইলে চিৎকার ও ক্রন্দন করা উচিত নহে, ইহাতে অভিযোগ প্রকাশ পায়।" হযরত ফুযায়ল ইবনে ইয়ায (র) হযরত বিশ্রে হাফী (র) ও হযরত ওহাব ইব্নে ওয়ারদ্ (র) পীড়িত হইলে গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতেন যাহাতে অপর লোকে তাঁহাদের পীড়ার সংবাদ পাইতে না পারে এবং তাঁহারা বলিলেন–"পীড়িতাবস্থায় লোকে যেন আমাদিগকে দেখিতে না আসে, ইহাই আমাদের ইচ্ছা।"

নবম অধ্যায়

মহব্বত, অনুরাগ ও সন্তোষ

আল্লাহ্‌র মহব্বত–আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে সর্বোচ্চ মকাম। এমন কি এই মকামে উপনীত হওয়ার জন্যই অন্যান্য মকামগুলি হাসিল করিতে হয়। তাই যে-সকল দোষ মানবকে আল্লাহ্‌র মহব্বত হইতে বিরত রাখে, বিনাশন খণ্ডে সেই সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যেন তৎসমুদয় দোষ হইতে মানব-হৃদয় পাকসাফ হইতে পারে। ইতিপূর্বে পরিত্রাণ খণ্ডে তওবা, সবর, শুকত্ব, সংসার বিরাগ, ভয় ও আশা ইত্যাদি যে-কয়টি বিষয় লেখা হইয়াছে, উহাও মহব্বতের পূর্ববর্তী সোপানমাত্র। অতঃপর 'অনুরাগ' এবং 'সন্তোষ' বলিয়া যাহা কিছু বর্ণিত হইবে তাহাও আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বতের ফল ও ইহারই অধীন। আল্লাহ্‌র মহব্বত যখন প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া মানবের সমস্ত হৃদয়রাজ্য জুড়িয়া লয় তখনই তাহার পরম উৎকর্ষ লাভ হয়। আল্লাহ্‌র মহব্বত এত প্রবল হইয়া না উঠিলেও অন্যান্য সকল পদার্থের ভালবাসা অপেক্ষা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা মানব-হৃদয়ে অধিক হওয়া আবশ্যক।

আল্লাহ্‌র মহব্বত হৃদয়ঙ্গম করা এরূপ দুঃসাধ্য যে, মুতাকাল্লিম আলিমগণ ইহাকে অস্বীকার করিয়া বলেন–"সমশ্রেণী ভিন্ন অপর কাহারও প্রতি মানব ভালবাসা স্থাপন করিতে পারে না এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার অর্থ তাঁহার আদেশ পালন ব্যতীত আর কিছুই নহে।" যাঁহারা এ কথা বলেন তাঁহারা মূল ধর্মের কোন খবরই রাখেন না। অতএব ইহার বিশদ ব্যাখ্যা আবশ্যক। প্রথমে আল্লাহর মহব্বত সম্বন্ধে শরীয়তের প্রমাণ প্রদান করিব এবং তৎপর ইহার হাকীকত ও বিধানসমূহ বর্ণনা করিব।

আল্লাহ্‌র মহব্বতের ফযীলত–আল্লাহ্‌র মহব্বত মানবের উপর ফরয–একথা সকল মুসলমান এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُمْ – অর্থাৎ 'আল্লাহ্ লোকদিগকে ভালবাসেন এবং তাহারা আল্লাহ্‌কে ভালবাসেন।" (সূরা মায়িদা, ৮ রুকূ, ৬ পারা।) রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে পর্যন্ত বান্দা আল্লাহ্ ও রাসূলকে

সর্বাপেক্ষা অধিক ভাল না বাসিবে সেই পর্যন্ত তাহার ঈমান ঠিক হয় না।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল–"ঈমান কি জিনিস?" তিনি বলিলেন–"আল্লাহ্‌র ও রাসূলকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসা।" তিনি অন্যত্র বলেন–"মানুষ যে-পর্যন্ত স্বীয় পরিবার-পরিজন, ধনদৌলত ও সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ অপেক্ষা আল্লাহ্ ও রাসূলকে অধিক ভাল না বাসিবে সেই পর্যন্ত সে ঈমানদার হইবে না।" আল্লাহ্‌ও ভীতি প্রদর্শনপূর্বক বলেন।

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ – الاية

অর্থাৎ "হে রাসূল, আপনি বলুন–তোমাদের পিতৃগণ, তোমাদরে পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীসকল তোমাদের আত্মীয়গণ ও তোমাদের ধনসম্পত্তি যাহা তোমরা অর্জন করিয়াছ এবং বাণিজ্য যাহা বন্ধ হওয়াকে তোমারা ভয় করিতেছ ও যে-গৃহসমূহ তোমরা পছন্দ করিতেছ, এই সমুদয় যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, ও তাঁহার রাসূল এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তবে আল্লাহ্ তাহার (শাস্তির) আদেশ উপস্থিত করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।" (সূরা তওবা, ৩ রুকূ, ১০ পারা।)

এক ব্যক্তি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট নিবেদন করিল– "হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি আপনাকে ভালবাসি।" তিনি বলিলেন–"(তাহা হইলে) দরিদ্রতা সহ্য করিতে প্রস্তুত থাক।" সেই ব্যক্তি আবার বলিল–"আমি আল্লাহ্‌কে ভালবাসি।" তিনি বলিলেন –"(তবে) বিপদাপদ সহ্য করিতে প্রস্তুত থাক।" হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আযরাঈল আলায়হিস সালাম হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের প্রাণহরণে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন–"তুমি কি কখনও দেখিয়াছ যে, বন্ধু বন্ধুর প্রাণ বিনাশ করে?" তৎক্ষণাৎ ওহী আসিল–"তুমি কি কখনও দেখিয়াছ যে, বন্ধু বন্ধুর সন্দর্শনে অসন্তুষ্ট হয়।" ইহা শুনিয়া হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম বলিলেন–"হে আযরাঈল, এখন প্রাণ বাহির করিয়া লও; আমি অনুমতি দিলাম।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে-সকল দু'আ করিতেন নিম্নলিখিত দু'আটি ইহাদের অন্যতম ঃ

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ اَحَبَّكَ وَحُبَّ مَايُقَرِّبُوْنِىْ اِلٰى حُبِّكَ وَاجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَرِدِ –

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, তোমার প্রতি ভালবাসা, তোমার প্রিয়জনের প্রতি ভালবাসা এবং যে বস্তু আমাকে তোমার ভালবাসার নিকটবর্তী করে তৎপ্রতি ভালবাসা আমাকে দান কর এবং শীতল পানি তৃষ্ণাতুরের নিকট যেরূপ প্রিয়, তোমার ভালবাসাকে আমার নিকট তদপেক্ষা প্রিয়তম কর।"

একজন আরব পল্লীবাসী নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্র রাসূল, কিয়ামত কবে হইবে?" হযরত (সা) বলিলেন–"হে পল্লীবাসী, সেই দিনের জন্য তুমি কি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ?" তিনি বলিলেন–"হে আল্লাহ্র রাসূল, (নফল) নামায, রোযার সম্বল আমার বেশী নাই; কিন্তু আল্লহ্ ও রাসূলকে আমি ভালবাসি।" হযরত (সা) বলিলেন–"যাহাকে তুমি ভালবাস কিয়ামতের দিন তুমি তাহার সঙ্গেই থাকিবে।" হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–যে-ব্যক্তি আল্লাহ্র খাঁটি মহব্বতের অস্বাদ পাইয়াছে, সে দুনিয়া হইতে বিমুখ হইয়াছে এবং সৃষ্ট জগতের প্রতি সে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।" হযরত হাসান বস্রী (র) বলেন–"যে-ব্যক্তি আল্লাহ্কে চিনিয়াছে, সে তাঁহাকে ভালবাসে এবং যে দুনিয়াকে চিনিয়াছে, সেই ইহাকে শত্রু বলিয়া জ্ঞান করে। আর মুসলমান উদাসীন না হইলে প্রফুল্ল থাকিতে পারে না, কারণ (পরকালের) চিন্তা করিলেই বিষণ্ন থাকিতে হয়।" হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাহাদিগকে অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ ও দুর্বল দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন–"তোমাদের উপর কি বিপদ বিপতিত হইয়াছে?" তাহারা বলিল–"আল্লাহ্র শাস্তির ভয়ে আমরা গলিয়া গিয়াছি।" তিনি ঘলিলেন–"আল্লাহ্ তোমাদিগকে শাস্তি হইতে নির্ভয় করিয়া দিবেন, এই আশা তোমরা তাঁহার নিকট করিতে পার।" হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম অপর এক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহারা ঐ সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক জীর্ণশীর্ণ ও দুর্বল ছিল। তিনি তাহাগিদকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "তোমাদের উপর কি বিপদ আসিয়াছে?" তাহারা নিবেদন করিল–"বেহেশ্তের লোভ আমাদিগকে এইরূপ করিয়া রাখিয়াছে।" তিনি বলিলেন–"তোমরা আশা করিতে পার যে, আল্লাহ্ তোমাদের আশা পূর্ণ করিবেন।" অবশেষে তিনি অপর এক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন, তাহারা পূর্ববর্তী উভয় সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক জীর্ণশীর্ণ ও দুর্বল ছিল। কিন্তু তাহাদের বদনমণ্ডল উজ্জ্বল দর্পণের ন্যায় ঝকমক করিতেছিল। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"তোমরা কি অবস্থায় আছ? তাহারা বলিল–"আল্লাহর' মতব্বত

আমাদিগকে এই দশায় আনয়ন করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া তিনি তাহাদের নিকট উপবেশন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন– "তোমরা আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্ত। তোমাদের নিকট উপবেশন করিবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি।"

হযরত সররী সক্তী (র) বলেন যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার পয়গম্বরের নামের সহিত যোগ করিয়া আহবান করা হইবে, যেমন–হে অমুক, মূসার (আ) উম্মত, হে অমুক ইসার (আ) উম্মত, হে অমুক, মুহাম্মদের (সা) উম্মত। কিন্তু আল্লাহ্-প্রেমিকদিগকে বলা হইবে–হে আল্লাহ্র বন্ধু, নিকটে আইস।' এইজন্য তাঁহাদের মন আনন্দে ভরিয়া যাইবে। কোন কোন পয়গম্বরের (আ) কিতাবে বর্ণিত আছে–"হে বান্দা, আমাকে তুমি ভালবাস বলিয়া আমিও তোমাকে ভালবাসি। কারণ, তুমি আমাকে ভালবাসিলে তোমাকে ভালবাসা আমার কর্তব্য।"

আল্লাহ্র মহব্বতের হাকীকত–আল্লাহ্র প্রতি মহব্বত এমন দুঃসাধ্য ব্যাপার যে, একদল আলিম ইহা অস্বীকার করিয়া বলেন–"আল্লাহ্র প্রতি মহব্বত হইতেই পারে না।" আল্লাহ্র প্রতি মহব্বত বিষয়টি এত সূক্ষ্ম যে, সকলে ইহা বুঝিতে পারে না। এইজন্য বিশদভাবে ইহার ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। দৃষ্টান্ত অবলম্বনে আমরা ইহা স্পষ্টরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। যে-ব্যক্তি তৎপ্রতি মনোযোগ দিবে, সে-ই বুঝিতে পারিবে।

মহব্বত ইশ্ক ও বিদ্বেষ–মহব্বতের মূল কি, তাহাই প্রথমে জানা আবশ্যক। যাহা ভাল বলিয়া বুঝা যায় তৎপ্রতি মনের আকর্ষণকে মহব্বত বলে। এই আকর্ষণ বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিলে ইহাকে ইশ্ক বলে। অপরপক্ষে যাহা মন্দ বলিয়া বুঝা যায় তৎপ্রতি মনে যে-ঘৃণা জন্মে, ইহাকে বিদ্বেষ বলে। যাহা ভাল বা মন্দ নহে, তৎপ্রতি মহব্বত বা বিদ্বেষ কিছুই জন্মে না।

এখন জানা আবশ্যক 'ভাল' কাহাকে বলে। মানব-স্বভাবের নিকট যাবতীয় বস্তু তিনভাগে বিভক্ত– (১) কতকগুলি বস্তুর স্বভাবের সহিত মিল আছে, এমন কি উহার প্রতি স্বভাবের আকর্ষণ থাকে এইরূপ বস্তুকে ভাল বস্তু বলে। (২) অপর কতকগুলি বস্তু স্বভাব-বিরোধী এবং ইহাদের স্বভাবের কোনই আকর্ষণ থাকে না। ইহা শ্রেণীর বস্তুকে মন্দ বস্তু বলে। (৩) আবার যে বস্তু স্বভাবের অনকূলও নহে এবং প্রতিকূলও নহে, তাহা ভালও নহে এবং মন্দও নহে।

জানিয়া রাখ, সম্যক পরিচয় লাভের পূর্বে কোন জিনিস ভাল কি মন্দ, ইহা

বুঝা যায় না এবং ইন্দ্রিয় ও বিবেকের সাহায্যে বস্তু পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয় পাঁচটি। আবার প্রতিটি ইন্দ্রয়ের উপভোগ্য বস্তু আছে। এইজন্যই ইন্দ্রয়ভোগ্য বস্তু মানব ভালবাসে; অর্থাৎ মানব-প্রকৃতি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। সুন্দর আকৃতি, শ্যামল শস্যক্ষেত্র, স্বচ্ছ সলিলা স্রোতস্বতী দেখিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি জন্মে। সুতরাং মানব এইসব ভালবাসে। সুমিষ্ট স্বর শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়। নাসিকার তৃপ্তি সুগন্ধ আঘ্রাণে, রসনার তৃপ্তি সুমিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণে এবং ত্বকের তৃপ্তি কোমল দ্রব্য স্পর্শনে হইয়া থাকে। এইজন্যই এই সকল বস্তু মানুষের মনে ভাল লাগে; অর্থাৎ এইগুলির দিকে মানব-প্রকৃতি আকৃষ্ট হয়। এই শ্রেণীর তৃপ্তি চতুষ্পদ জন্তুগণও উপভোগ করিতে পারে।

মানব-হৃদয়ে আর একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। ইহাকে জ্ঞান, অন্তরচক্ষু বা নূর বলে, অথবা এইরূপ যে-কোন শব্দে ইহার নামকরণ করিতে পার। ইহার কারণেই মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। এই ষষ্ঠ ইন্দ্রয়েরও জ্ঞাতব্য বস্তুসমূহ আছে এবং এইগুলিও তাহার নিকট তৃপ্তিদায়ক ও মুগ্ধকর। উপরিউক্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেমন বাহ্য উপভোগ বস্তুতে তৃপ্তি লাভ করে এবং তৎপ্রতি আসক্ত ও আকৃষ্ট হয় তদ্রূপ এই জ্ঞানালোকও স্বীয় জ্ঞাতব্য বস্তুসমূহে তৃপ্তি লাভ করে এবং তৎপ্রতি আসক্ত ও আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্ দুনিয়াতে তিন বস্তু আমার প্রিয় করিয়া দিয়াছেন–স্ত্রী, সুগন্ধি দ্রব্য এবং নামাযে, আমার চোখের পুত্তলি শীতল হয়।" তিনি নামায হইতে পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন বলিয়া ইহার আসন অতি উচ্চে স্থাপন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি আকৃতিতে মানুষ, কিন্তু স্বভাবে পশু এবং অন্তর রাজ্যের অবস্থা অবগত নহে ও নিজের দৈহিক দাবীদাওয়া ব্যতীত আর কিছুই জানে না, সেই ব্যক্তি কখনও নামাযকে উত্তম বলিয়া বিশ্বাস করে না এং নামাযকে ভালবাসিতেও পারে না। কিন্তু যাঁহার অন্তরে বুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং যিনি পশু স্বভাবের সীমা অতিক্রম করত ঊর্ধ্বে উঠিয়াছেন, তিনি আল্লাহ্‌র অনন্ত সৌন্দর্য ও বিস্ময়কর শিল্পকৌশল পর্যবেক্ষণ করিয়া এবং তাঁহার সত্ত্বা ও গুণাবলীর প্রভাব অনুভব করত যেরূপ পরিতৃপ্ত হন, বাহ্য চর্মচক্ষে সুন্দর সুন্দর আকৃতি, শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও মনোরম স্রোতস্বতী দর্শনে তত পরিতৃপ্তি কখনও পাইতে পারেন না। বরং আল্লাহ্‌র অনুপম সৌন্দর্য জ্ঞানচক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলে যেরূপ অপূর্ব পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়, ইহার তুলনায় অন্যান্য সমস্ত তৃপ্তি নিতান্ত তুচ্ছ হইয়া উঠে।

মহব্বতের কারণ–যে-সমস্ত কারণে হৃদয়ে মহব্বত জন্মে তাহা বুঝিতে পারিলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কেহই ভালবাসার পাত্র হইতে পারে না।

পাঁচটি কারণে ভালবাসা জন্মে।

প্রথম কারণ– লোকে স্বভাবতই নিজকে এবং নিজের জীবনকে ভালবাসে। আর বিনাশপ্রাপ্ত হওয়া কষ্টকর না হইলেও সে নিজের বিনাশ হওয়াকে পছন্দ করে না। মানব কিরূপে নিজকে ভালবাসিবে না? কারণ মানব যখন স্বীয় স্বভাব-সুলভ পদার্থ ভালবাসে তখন তাহার নিকট নিজ জীবন, চিরস্থায়ী অস্তিত্ব এবং নিজের পূর্ণ গুণাবলী অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় পদার্থ আর কি হইতে পারে? অপর দিকে নিজের বিনাশ ও গুণের বিলুপ্তি অপেক্ষা অধিক স্বভাববিরুদ্ধ ও অপছন্দনীয় আর কি থাকিতে পারে? এই জন্যই মানুষ নিজ সন্তানকেও ভালবাসে। কারণ সে সন্তানের অস্তিত্বকে নিজের অস্তিত্বের অনুরূপ বলিয়াই মনে করে। মানব চিরকাল জীবিত থাকিতে পারে না। তজ্জন্য সন্তানের অস্তিত্বকে নিজের অস্তিত্বের অনুরূপ মনে করিয়া লোকে সন্তানকে ভালবাসে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে সে পুত্রকেই ভালবাসিতেছে না, বরং নিজেকেই ভালবাসিতেছে। ধন জীবন ধারণের উপকরণ বলিয়া ইহাকেও লোকে ভালবাসে। নিজের আত্মীয়-স্বজনকেও লোকে ভালবাসিয়া থাকে। কারণ, সে তাহাদিগকে নিজ বাহু বলিয়া মনে করে এবং ধারণা করে যে, তাহাদের দ্বারাই সে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান আছে।

দ্বিতীয় কারণ– উপকার প্রাপ্তি। যাহার নিকট হইতে উপকার পাওয়া যায়, স্বভাবতই লোকে তাহাকে ভালবাসে। এইজন্যই বুযুর্গগণ বলেন

اَلْاِنْسَانُ عَبِيْدُ الْاِحْسَانِ – অর্থাৎ "মানুষ উপকারের নিকৃষ্ট গোলাম" এবং রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রার্থনা করিতেন– " হে আল্লাহ্, তুমি কোন দুষ্ক্রিয়াশীল লোককে আমার উপকার করিবার ক্ষমতা দিও না। কারণ, তদ্রূপ লোক উপকার করিলে আমার মন তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিবে।" এই কথার অর্থ এই যে, উপকারীর প্রতি স্বভাবতই মানব মনে ভালবাসার সঞ্চার হয় এবং মনকে ভালবাসিতে বাধা দিয়া নিরস্ত করা যায় না। উপকারীর প্রতি যে ভালবাসার সঞ্চার হয় ইহাও আত্মপ্রেমের উপলক্ষেই জন্মিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, অপরের প্রতি এমন কাজ করাকে উপকার বলে

যাহা তাহার জীবন ধারণ এবং উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক হয়। এইজন্যই মানব অটুট স্বাস্থ্য ভালবাসে এবং স্বাস্থ্যলাভের জন্যই সে চিকিৎসককেও ভালবাসে। এইরূপ মানুষ স্বভাবতই নিজকে এবং নিজরে শরীরকে ভালবাসে। উপকার পাইলেই মন উপকারীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

তৃতীয় কারণ– সাক্ষাতভাবে কোন উপকার লাভ করিয়া না থাকিলেও মানুষ সৎলোককে ভালবাসে। কারণ, কেহ যদি শুনতে পায় যে, সুদূর পাশ্চাত্য দেশে এমন একজন জ্ঞানী ও সুবিচারক বাদশাহ আছেন যাঁহার সুশাসনে সেই দেশের অধিবাসিগণ পরম সুখ ও শান্তিতে কালাতিপাত করিতেছে, তবে এইরূপ বাদশাহ্‌র প্রতি তাহার মনে ভালবাসার উদ্রেক হইয়া থাকে, অথচ সে ভালরূপে জানে যে, সে কখনও পাশ্চাত্য দেশে যাইবে না এবং উক্ত বাদশাহ হইতে কোন উপকার লাভ করিবে না।

চতুর্থ কারণ–সুন্দর ব্যক্তিকে লোকে ভালবাসে। সুন্দর লোকের নিকট হইতে কিছু পাওয়ার আশা এই ভালবাসার কারণ নহে; বরং সৌন্দর্যের প্রতি মানব মনে যে স্বাভাবিক আকর্ষণ রহিয়াছে তজ্জন্য সে স্বয়ং সৌন্দর্যকেই ভালবাসে। সবুজ শস্যক্ষেত্র ও স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বতীকে লোকে যেমন ভালবাসে এই সমস্ত পানাহাররূপে তাহার উপভোগ আসিবে বলিয়াই তাহার হৃদয়ে তৎপ্রতি ভালবাসার সঞ্চার হয় না, বরং এই সকল নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখিয়াই লোকে সুখ ও শান্তি পাইয়া থাকে, তদ্রূপ সুন্দর আকৃতিকেও কামভাব ব্যতীতই মানবের পক্ষে ভালবাসা সম্ভবপর। কারণ সৌন্দর্য মানবের চিরপ্রিয় বস্তু। অতএব আল্লাহ্‌র অনুপম সৌন্দর্য অবগত হইলে মানব তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। সৌন্দর্যের পরিচয় পরে দেওয়া হইবে।

পঞ্চম কারণ– স্বভাবের সাদৃশ্য। ইহার কারণ এই যে, যাহাদের স্বভাবে সাদৃশ্য থাকে তাহাদের মধ্যে স্বভাবত ভালবাসা জন্মে। এই সাদৃশ্য কখন কখন প্রকাশ্যে ধরা পড়ে; যেমন বালকের সহিত বালকের বন্ধুত্ব জন্মে এবং লম্পটের সহিত লম্পটের, আলিমের সহিত আলিমের এবং প্রতিটি ব্যক্তির তাহার সমশ্রেণীর লোকের সহিত বন্ধুত্ব জন্মিয়া থাকে। আবার কখন কখন এই সাদৃশ্য গুপ্তভাবে থাকে। সৃষ্টির মূলে যে-সকল স্বাভাবিক কারণ বিদ্যমান থাকে, মানব-জীবনের প্রারম্ভে সেই কারণের সমতা ঘটিলে ভবিষ্যত জীবনে তাহাদের মধ্যে সখ্যতা জন্মে। সৃষ্টিগত যে কারণে পরস্পর সখ্যতা জন্মে, ইহা কাহারও ক্ষমতাধীন নহে, উহা বুঝাইতে যাইয়াই রাসূলে মাক্‌বুল সাল্লাল্লাহু

আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন "

اَلْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ -

অর্থাৎ "বিভিন্ন দলভুক্ত আত্মাসমুহকে একত্র করা হইল। তন্মধ্যে যাহাদের পরস্পর সাক্ষাত-পরিচয় ঘটিল তাহাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মিল এবং যাহাদের মধ্যে কোনরূপ সাক্ষাত ও পরিচয় ঘটে নাই তাহাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মে নাই।" এই কথার অর্থ এই যে, আত্মাসমূহের পরস্পর আত্মীয়তা ও অনাত্মীয়তা উভয়ই ঘটে। আধ্যাত্মিক জগতে যাহাদের মধ্যে আত্মীয়তা ঘটিয়াছে ইহজগতেও তাহাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মে। এই সাদৃশ্য (আত্মীয়তা) সম্বন্ধেই উপরে বলা হইয়াছে এবং ইহার বিস্তৃত বর্ণনা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত।

সৌন্দর্যের হাকীকত– যাহারা মর্যাদায় প্রায় পশুতুল্য এবং বাহ্য দৃষ্টিশক্তি রাখে মাত্র, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত, তাহারা একমাত্র শারীরিক গঠন ও মুখমণ্ডলের লালিত্য এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের সুসামঞ্জস্য বর্ধনকেই সৌন্দর্য বলিয়া থাকে। তাহারা মনে করে যে, শুধু আকার ও বর্ণ অবলম্বনেই সৌন্দর্য বিরাজমান থাকে এবং যে পদার্থে আকার ও বর্ণ নাই, তাহা সুন্দর হওয়া অসম্ভব। কিন্তু এই ধারণা নিতান্ত ভুল। কারণ, বুদ্ধিমান লোকেরা শরীরী ও অশরীরী উভয় প্রকার পদার্থকেই সুন্দর বলিয়া থাকেন। যেমন–লেখা সুন্দর, আওয়ায সুন্দর, বস্ত্র সুন্দর, অশ্ব সুন্দর, গৃহ সুন্দর, বাগান সুন্দর, শহর সুন্দর। প্রত্যেক পদার্থ যেরূপ বিকাশ পাওয়ার উপযোগী তদ্রূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইলে এবং ইহাতে কোন প্রকার কমতি না থাকিলেই ইহাকে সুন্দর বলা যায়। প্রত্যেক পদার্থের চরম বিকাশ ও পূর্ণত্ব এক রকমের নহে। লিখনের পূর্ণত্ব বলিলে ইহাই বুঝা যায় যে, ইহার হরফ, মাত্রা, ব্যবধান ইত্যাদির মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। সুন্দর লিখন ও সুন্দর গৃহ দর্শনে এক প্রকার আনন্দ অনুভবে আসে। সুতরাং মুখমণ্ডলের আকৃতি ও বর্ণের উপর সৌন্দর্য নির্ভরশীল নহে। বাহ্যিক সৌন্দর্য চর্মচক্ষে ধরা পড়ে। এই সকল কথা স্বীকার করিয়াও কেহ হয়ত বলিতে পারে–চক্ষে দর্শন না করিলে সৌন্দর্য জ্ঞান জন্মে না। বস্তুত এই কথা অজ্ঞতাপ্রসূত। কারণ, আকার ও বর্ণহীন বস্তুকেও আমরা সুন্দর বলিয়া থাকি। যেমন–অমুক ব্যক্তির স্বভাব সুন্দর, তাহার শিষ্টতা অতি সুন্দর। এতদ্ব্যতীত

ইহাও বলা হয়–পরহেযগারীর সহিত ইলম অতি সুন্দর, বদান্যতার সহিত বীরত্ব অতি সুন্দর গুণ; পরহেযগারী, নির্লোভতা, অল্পে পরিতৃপ্তি অতি সুন্দর। এবংবিধ কথা বিশেষ প্রচলিত এবং সকলেই জানে। কিন্তু এই গুণগুলি কেহই চর্মচক্ষে দেখিতে পায় না–কেবল জ্ঞানচক্ষে বুঝিতে পারে।

বিনাশন খণ্ডের 'রিয়াযত' নামক অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, মানুষের আকৃতি দ্বিবিধ–একটি শরীরের বাহ্য আকৃতি ও অপরটি অন্তরের গুপ্ত আকৃতি। সৎস্বভাব তাহার অন্তরের গুপ্ত আকৃতি এবং স্বভাবতই মানুষ ইহা ভালবাসে। ইহার প্রমাণ এই যে, বর্তমান কালের লোকেও হযরত ইমাম আবূ হানিফা (র) এবং হযরত ইমাম শাফিঈকে (র), এমন কি তাঁহাদের বহু পূর্ববর্তী হযরত আবূ বরক সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্হু এবং হযরত ওমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু আন্হুকেও ভালবাসিয়া থাকে। ইহা মোটেই অসম্ভব নহে। আর কিরূপেই বা অসম্ভব হইবে? কারণ, অদ্যাবধি বহু লোক তাঁহাদের মহব্বতে নিজেদের জান-মাল কুরবান করিতেছে। সুন্দর আকৃতি এই মহব্বতের কারণ নহে; কেননা এই সকল লোকে কখনও তাঁহাদিগকে দেখে নাই। তাঁহাদের দেহ মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে। বরং তাঁহাদের আন্তরিক সৌন্দর্য-মাধুরীর কারণেই এইসব লোকের হৃদয়ে তাঁহাদের প্রতি ভালবাসার উদ্রেক হইয়াছে। আর তাঁহাদের আন্তরিক সৌন্দর্যের উৎস হইল তাঁহাদের অপরিসীম জ্ঞান, অতুলনীয় পরহেযকারী, নিরপেক্ষ শাসন ইত্যাদি। এই কারণেই পয়গম্বরদিগকেও লোকে ভালবাসে। যাহারা হযরত আবূ বরক সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে ভালবাসে, তাহারা শারীরিক সৌন্দর্যের জন্য তাঁহাকে ভালবাসে না বরং যে-গুণের কারণে তাঁহাকে সিদ্দীক বলা হয়, সেই গুণের জন্যই তাঁহাকে ভালবাসে। আর 'সিদ্দীক' হওয়ার গুণটি 'সিদক' (সত্যবাদিতা) ও 'ইলম' এই দুইটির সমন্বয়ে গঠিত একটি অবিভাজ্য গুণ। কারণ, ইহার কোন আকার ও বর্ণ নাই। এইজন্যই এক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত এই গুণটির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যে প্রকারেই হউক না কেন, এই গুণটির কোন আকৃতি ও বর্ণ নাই। এই গুণের কারণেই লোকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্হুকে ভালবাসে। ইহা ছাড়া তাঁহার শারীরিক আকৃতি ও সৌন্দর্যের জন্য তাহারা তাঁহাকে ভালবাসে না।

যাহাই হউক, এ-পর্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল তাহা পাঠ করিলে কোন বুদ্ধিমান লোকই চরিত্রগত আন্তরিক সৌন্দর্য অস্বীকার করিতে পারিবে না এবং আকৃতি ও বর্ণগত সৌন্দর্য অপেক্ষা চরিত্রগত গুপ্ত সৌন্দর্যকে সে অধিক ভালবাসিতে

বাধ্য হইবে। প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত মূর্তিকে যাহারা ভালবাসে এবং যাহারা পয়গম্বরকে ভালবাসে, এই উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালককে কাহারও প্রতি অনুরক্ত করিতে চাহিলে তাহার সম্মুখে সেই ব্যক্তি ভ্রূযুগল, চক্ষু ও বদনমণ্ডলের সৌন্দর্যের প্রশংসা করিলে কোন ফল হয় না; বরং দানশীলতা, ইলম ও শক্তিমত্তার প্রশংসা করিয়া তাহাকে অনুরক্ত করিতে হয়। আবার বালককে শত্রু করিয়া তুলিবার ইচ্ছা করিলে তাহার সম্মুখে আন্তরিক কদর্যতার বর্ণনা করিতে হয়; শারীরিক কদর্যতার বর্ণনা করিলে কোন লাভ হয় না। এইজন্যই মুসলমানগণ সাহাবাগণকে ভালবাসে এবং আবূ জেহেলের প্রতি দুশমনি পোষণ করে।

উপরের বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, সৌন্দর্য দুই প্রকার; যথাঃ–বাহ্য ও আন্তরিক এবং বাহ্য সৌন্দর্যের ন্যায় আন্তরিক সৌন্দর্যও লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। আবার সামান্য বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকেও বাহ্য সৌন্দর্য অপেক্ষা আন্তরিক সৌন্দর্যের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

একমাত্র আল্লাহ্ই ভালবাসার উপযুক্ত–বাস্তবপক্ষে আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কেহই ভালবাসার উপযুক্ত নহে। আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে ভালবাসিলে ইহাই বুঝা যাইবে যে, সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র পরিচয় পায় নাই। তবে যাঁহারা আল্লাহকে চিনিয়াছেন, তাঁহারা আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার দরুনই অপরকে ভালবাসিয়া থাকেন; যেমন রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসাও আল্লাহ্কেই ভালবাসা। কারণ যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার প্রিয়পাত্রকেও ভালবাসিয়া থাকে। এইরূপ আলিম এবং মুত্তাকী লোকদের প্রতি ভালবাসাও আল্লাহর প্রতি ভালবাসা হইতেই জন্মিয়া থাকে। ফলকথা এই যে, ভালবাসার কারণসমূহ লইয়া বিচার করিয়া দেখিলে একমাত্র আল্লাহই যে ভালবাসার উৎস, এই বিষয়টি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

প্রথম বিচার– পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মানুষ নিজকে এবং স্বীয় গুণাবলীকে ভালবাসে। এই আত্মপ্রেমের কারণেই আল্লাহকে ভালবাসা মানুষের কর্তব্য; কেননা তাহার অস্তিত্ব এবং গুণাবলী সমস্তই আল্লাহর দান। তাঁহার দয়া না হইলে মানুষ নাস্তির পর্দার অপর পার হইতে অস্তিত্বের জগতে আসিতে পারিত না। আবার তাঁহার অপার করুণায়ই মানুষ রক্ষা পাইয়া থাকে। তৎপর আল্লাহ্ দয়া করিয়া মানুষকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গুণাবলী প্রদান না করিলে জগতে সে-ই সর্বাপেক্ষা অসম্পূর্ণ ও অধম থাকিত। কোন রৌদ্রদগ্ধ ব্যক্তি যদি রৌদ্রের উত্তাপ

হইতে বাঁচিবার জন্য গাছের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তজ্জন্য ছায়াকে ভালবাসে, কিন্তু যে বৃক্ষ হইতে ছায়া পাওয়া যায়, সেই বৃক্ষকে ভাল না বাসে, তবে ইহা অতীব আশ্চর্যের বিষয়। বৃক্ষ হইতে যেমন ছায়া পাওয়া যায় তদ্রূপ নিজ দেহ ও গুণাবলী সমস্তই আল্লাহ্ হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই বিষয়টি যে ব্যক্তি বুঝিয়া লইয়াছে, সে আল্লাহকে ভাল না বাসিয়া কিরূপে থাকিতে পারে? ইহা সত্য যে, জাহিল আল্লাহকে ভালবাসে না। কারণ তাঁহার পরিচয়-জ্ঞানের ফলেই তৎপ্রতি ভালবাসা জন্মিয়া থাকে এবং জাহিল ব্যক্তি তাঁহার পরিচয়-জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

দ্বিতীয় বিচার–লোকে উপকারীকে ভালবাসে। এইজন্যই যে-ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে ভালবাসে সে নিতান্ত মূর্খ; কারণ, আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কেহ কোন উপকার করেও নাই এবং করিতেও পারে না। আল্লাহ্ কত প্রকারে মানুষের উপকার করেন, কেহই ইহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারে না। এই সম্বন্ধে শুক্‌র ও তাফাক্কুর অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। প্রিয় পাঠক কোন লোকের মধ্যস্থায় উপকার পাইয়া যদি মনে কর যে, সে নিজেই তোমার উপকার করিয়াছে তবে নিতান্ত ভুল করা হইবে। কারণ আল্লাহ তাহার অন্তরে এক দণ্ডধারী পিয়াদা নিযুক্ত করিয়া এই কথা মনে জাগরিত করিয়া দেন যে, তোমাকে কিছু দান করিলেই সে ইহপরকালের মঙ্গল লাভ করিবে, তাহার উদ্দেশ্য সফল হইবে। এই পিয়াদার বিরুদ্ধাচরণ সে করিতে পারে না। এইজন্যই সে দান করে; অন্যথায় সে কিছুই দিত না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সে নিজেকেই দিতেছে; কেননা সে কিছু দান করিয়া ইহাকে পরকালের সওয়াব বা দুনিয়ার যশ ইত্যাদি লাভের উপকরণ করিয়া লইতেছে। বাস্তবপক্ষে তুমি ঐ উপকার আল্লাহ হইতেই পাইয়াছ। কারণ, তোমাকে দান করাতেই যে সেই ব্যক্তির ইহপরকালের মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে, এই বিশ্বাস তাহার হৃদয়ে আল্লাহ্ বিনা স্বার্থে জাগ্রত করিয়া দিয়া তাহাকে দানকার্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। শুক্‌র অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় বিচার–পরোপকারী ব্যক্তিকে লোকে ভালবাসে যদিও সকলেই প্রত্যক্ষভাবে তাহার নিকট হইতে উপকার পায় না। মনে কর, এক ব্যক্তি শুনিল, সুদূর পাশ্চাত্য দেশের এক বাদশাহ বড় সুবিচারক এবং লোকের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল ও অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনার্থে সর্বদা তিনি স্বীয় কোষাগার উন্মুক্ত রাখেন। আর তাঁহার রাজ্যের কেহই কাহারও উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে

পারে না। শ্রোতা যদিও জানে যে, সেই বাদশাহ্‌র সঙ্গে তাহার দেখা হইবার ও তাঁহার নিকট হইতে উপকার পাইবার কোন সম্ভাবনাই তাহার নাই, তথাপি অবশ্যই সে তাঁহাকে ভাল না বলিয়া পারে না। এইজন্যই আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে ভালবাসা নিতান্ত মূর্খতা। কারণ, উপকার তাঁহাকে ব্যতীত অপর কাহারও নিকট হইতে পাওয়া যায় না। তাঁহার আদশ ও তাকিদেই দুনিয়াতে একে অন্যের উপকার করিয়া থাকে। মানবের প্রতি আল্লাহর দান কত অধিক! তিনি দয়া করিয়া মানব সৃষ্ট করিয়াছেন এবং তাহার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাও তিনি দান করিয়াছেন। এমন কি, যে-দ্রব্য প্রয়োজনীয় নহে কেবল শোভা-সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক তাহা আল্লাহ্ পর্যাপ্ত পরিমাণে মানুষকে দান করিয়াছেন। ভূমণ্ডল ও গগনমণ্ডল, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের প্রতি গভীরভাবে মনোবিনেশ করিলে আল্লাহ্‌র আশ্চর্য সৃষ্টিকৌশল, অসীম দয়া, অতুলনীয় দানের কথা মানব উপলব্ধি করিতে পারে।

চতুর্থ বিচার– ভালবাসার অপর কারণ সৌন্দর্য। এ-স্থলে সৌন্দর্য অর্থে চরিত্রগত মাধুর্য ও আন্তরিক সৌন্দর্যকেই বুঝাইতেছে। এইজন্যই হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) ও হযরত ইমাম শাফিঈকে (র) লোকে ভালবাসে। কেহ হযরত আলী রাযিল্লাহু আন্‌হুকে ভালবাসে। কেহবা হযরত আবূ বরক সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু ও হযরত ওমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে ভালবাসে। আবার কেহবা সকলকেই ভালবাসে, এমন কি, সকল পয়গম্বরকেও ভালবাসে। তাঁহাদের আন্তরিক সৌন্দর্য ও গুণই এই ভালবাসার একমাত্র কারণ।

লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, তিনটি বস্তুর কারণে আন্তরিক সৌন্দর্য বিকশিত হইয়া থাকে; যথাঃ– (১) ইলম। কারণ, সৎ ও মহৎ বলিয়াই লোকে ইলম ও আলিমকে ভালবাসে। জ্ঞান যত অধিক ও জ্ঞাতব্য বিষয় যত মহৎ হয়, আন্তরিক সৌন্দর্য তত বৃদ্ধি পায়। যেহেতু জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের মধ্যে আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, অতএব আল্লাহ্ এবং তাঁহার দরবার সম্পর্কীয় জ্ঞানও সর্বোত্তম। আল্লাহ্‌র দরবার বলিতে ফিরিশ্‌তা, আসমানী কিতাব, রাসূল ও পয়গম্বরের শরীয়ত এবং ভূমণ্ডল-নভোমণ্ডল ও ইহপরকালের পরিচালনা পদ্ধতিকে বুঝায়। এই জ্ঞানে পয়গম্বর ও সিদ্দীকগণ বিভূষিত বলিয়াই তাঁহারা লোকের নিকট এত প্রিয়। (২) ক্ষমতা অর্থাৎ যে ক্ষমতার বলে নিজ আত্মা ও আল্লাহর বান্দাগণের চরিত্র-সংশোধন, তাহাদের উপর সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং পার্থিব ও ধর্ম-রাজ্যে শৃঙ্খলা বিধান করা চলে। (৩) দোষত্রুটি শূন্যতা এবং যাবতীয় কুস্বভাব হইতে

পাক-পবিত্রতা এই সমস্ত গুণকেই লোকে ভালবাসে, কার্যকে ভালবাসে না। কারণ, যে কাজ এই সকল গুণের প্রভাবে না হইয়া ঘটনাচক্রে বা বেখেয়ালে সংগঠিত হয়, তাহা প্রশংসনীয় নহে। সুতরাং যাহার মধ্যে এই গুণসমূহ যত অধিক থাকে, সে তত অধিক ভালবাসা পাইয়া থাকে। এই কারণেই লোকে হযরত আবূ বক্‌র রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) ও হযরত ইমাম শাফিঈ (র) অপেক্ষা অধিক ভালবাসে।

উপরিউক্ত তিনটি গুণের সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখ। এই গুণগুলি আল্লাহ্‌র মধ্যে যেরূপ অসীম ও পূর্ণমাত্রায় আছে, সেই পরিমাণে মানুষের মধ্যে কখনও সম্ভবপর নহে। এইজন্য বাস্তবপক্ষে আল্লাহই ভালবাসা পাইবার যোগ্যতম পাত্র। কেননা আল্লাহ্‌র জ্ঞানের সহিত আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সকল ফিরিশ্‌তা ও জিন-মানবের জ্ঞান তুলনা করিলে সকলের জ্ঞানসমষ্টি তুচ্ছ ও নগণ্য বলিয়া বুঝিতে না পারে, এমন অজ্ঞ কেহই নাই। আল্লাহ্ সকলকে লক্ষ করিয়া বলেনঃ

وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً -

অর্থাৎ "জ্ঞান হইতে তোমাদিগকে অতি সামান্যমাত্রই দেওয়া হইয়াছে।" (সূরা বানী ইসরাঈল, ১০ রুকূ, ১৫ পারা।) এমন কি, জগতের সমস্ত লোক একত্র হইয়া এক পিপীলিকা বা মশার সৃজনে আল্লাহ্‌র যে-জ্ঞান ও কৌশল রহিয়াছে, তাহা জানিতে চাহিলে ইহার পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না। আর যাহা কিছু জানিবে তাহাও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহেই জানিবে। কারণ আল্লাহ্‌ই মানবকে ইলম দান করিয়াছেন; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

خَلَقَ الْإِنْسَانَ - عَلَّمَهُ الْبَيَانَ -

অর্থাৎ "আল্লাহ্ মানব সৃষ্টি করিয়াছেন; তাহাকে কথা বলিতে শিক্ষা দিয়াছেন।" (সূরা আর্‌রাহমান, ১ রুকূ, ২৭ পারা।) সমস্ত মাখলূকাতের জ্ঞানসমষ্টিও নিতান্ত সীমাবদ্ধ। অপরপক্ষে যে দিক দিয়া বা যে-কোন বস্তুর সম্বন্ধে দেখা যাউক না কেন, আল্লাহ্‌র জ্ঞানের কোনই সীমা নাই। মানুষের জ্ঞান আল্লাহ্ হইতেই লব্ধ। অতএব যাবতীয় জ্ঞান একমাত্র তাঁহারাই। তাঁহার জ্ঞান মাখ্‌লূকাত হইতে লব্ধ নহে।

ক্ষমতা সম্বন্ধে দেখিলে বুঝিতে পারিবে ইহাও মানুষের প্রিয় বস্তু। এইজন্যই হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর বীরত্ব ও হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর সুবিচার ও সুশাসন লোকে ভালবাসে। কারণ, এই দ্বিবিধ গুণও এক

প্রকার ক্ষমতা। কিন্তু আল্লাহ্‌র সর্ববিধ পূর্ণ ক্ষমতার তুলনায় সমস্ত জগতবাসীর ক্ষমতা কিছুই নহে। মনুষ্যাদি জীবমাত্রই ক্ষমতা বিষয়ে নিতান্ত অপূর্ণ ও অসহায়। বরং আল্লাহ্ দয়া করিয়া তাহাদিগকে যতটুকু ক্ষমতা দিয়াছেন তদভিন্ন তাহাদের কিছুই নাই। একটি মাছি মানুষের কোন দ্রব্য খাইলে সেই মাছির নিকট হইতে ইহা ফিরাইয়া লইতে তাহার ক্ষমতা নাই। এখন ভাবিয়া দেখ, মানুষ কত অক্ষম! আল্লাহ্‌র ক্ষমতা পূর্ণ; আবার ইহার পরিমাণ কত ইহারও অবধি নাই। কারণ, আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে, যথাঃ–জিন, মানুষ জীবজন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদি সমস্তই তাঁহার পূর্ণ অমোঘ ক্ষমতা দ্বারা উৎপন্ন। এতদ্ব্যতীত এবংবিধ অসংখ্য-অগণিত পদার্থ সৃজনে তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ ব্যতীত আর কে ক্ষমতার জন্য ভালবাসা পাইতে পারে?

অতঃপর বিচার করিয়া দেখ, মানুষ কখনও একেবারে দোষ-ত্রুটিশূন্য হইতে পারে না। মানুষের প্রথম ত্রুটি এই যে, সে সৃষ্ট দাস ও তাহার অস্তিত্ব নিজের দ্বারা উৎপন্ন হয় নাই; বরং আল্লাহ কর্তৃক সে সৃষ্ট হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা মানবের আর কি বড় ত্রুটি হইতে পারে? তৎপর মানুষ নিজের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধেই একেবারে বেখবর। এমতাবস্থায় সে অপর পদার্থের জ্ঞান রাখিবে কিরূপে? মানব-মস্তকের একটি শিরা স্থানচ্যুত হইলে সে পাগল হইয়া যায়। কিন্তু সে ইহার কারণ বুঝিতে পারে না। আর সেই রোগের ঔষধ তাহার সম্মুখে বিরাজমান থাকিলেও সে ইহা চিনিয়া লইতে পারে না। মানুষের অসহায়তা ও অজ্ঞতার হিসাব করিলে বুঝিতে পারিবে, মানব সিদ্দীক বা পয়গম্বরই হউক না কেন, যে যৎসামান্য জ্ঞান ও ক্ষমতা পাইয়াছেন, তাহা অজ্ঞানতা ও অসহায়তার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

অতএব, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ই সর্ববিধ দোষ-ত্রুটি হইতে একেবারে পাক পবিত্র! তাঁহার জ্ঞানের সীমা নাই—ইহাতে অজ্ঞানতার লেশমাত্রও নাই। আবার তিনি সর্বোপরি সর্বোচ্চ ও পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। কারণ, সপ্ত আকাশ ও সপ্ত পাতাল তাঁহার ক্ষমতার হস্তে রক্ষিত এবং সমস্ত মাখলূকাত বিনাশ করিয়া ফেলিলেও তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও বাদশাহীর বিন্দুমাত্রও লাঘব হইবে না; আবার তিনি চাহিলে নিমিষের মধ্যে লক্ষ লক্ষ জগত সৃষ্টি করিতে পারেন এবং ইহাতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব বিন্দুমাত্রও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে না। কেননা, তাঁহার সর্ববিধ গুণই পূর্ণ—ইহাতে হ্রাস বৃদ্ধির মোটেই অধিকার নাই। তিনি সর্ববিধ দোষ-ত্রুটি

হইতে মুক্ত। নাস্তি বা অভাব তাঁহার বা তাঁহার গুণের মধ্যে স্থান পায় না এবং তাঁহার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি থাকা সম্ভবপরই নহে। সুতরাং এমন আল্লাহ্‌কে ভাল না বাসিয়া অপরকে ভালবাসিতে যাওয়া নিরেট মূর্খতা।

যাঁহার সমস্ত গুণই নিষ্কলঙ্ক ও পূর্ণ এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রতি যে ভালবাসা জন্মে ইহা উপকার-প্রাপ্তিজনিত ভালবাসা হইতে বহু উন্নত। কারণ, উপকারের অল্পতা ও আধিক্য অনুসারে উপকারজনিত ভালবাসায় তারতম্য হয়। কাজেই আল্লাহর প্রতি ভালবাসা যখন তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব ও পাক পবিত্রতার দরুন হয় তখন ইহা অতীব উন্নত ও পূর্ণ হইয়া থাকে। এইজন্যই হযরত দাউদ আলায়হিস সালামের প্রতি আল্লাহ ওহী অবতীর্ণ করেন–"যে বান্দা শাস্তির ভয়ে ও প্রাপ্তি লোভে ইবাদত না করিয়া আমার প্রভুত্বের হক আদায় করণার্থ ইবাদত করে, সে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়।' যবূর কিতাবে বর্ণিত আছে–"যে-ব্যক্তি বেহেশ্‌তের আশায় ও দোযখের ভয়ে আমার ইবাদত করে, তাহা অপেক্ষা বড় যালিম আর কে? বেহেশত ও দোযখ সৃষ্টি না করিলে কি আমি ইবাদত ও বন্দেগী পাইবার উপযুক্ত হইতাম না?"

পঞ্চম বিচার–সাদৃশ্য ও সম্পর্ক থাকিলে পরস্পরে ভালবাসা জন্মে। আল্লাহ্‌র সহিত মানুষের এক বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। এই সম্পর্কের কথাই নিম্ন বাণীসমূহে বর্ণিত আছে ঃ

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ – অর্থাৎ "রূহ্ আল্লাহ্‌র আদেশে সৃষ্ট। হাদীস শরীফে আছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ – অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদমকে (আ) তাঁহার গুণদ্বারা বিভূষিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।" হাদীস শরীফে অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ বলেন–"আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করিলে আমি তাহাকে নিজের বন্ধু বানাইয়া লই; তখন আমিই তাহার কর্ণ, চক্ষু ও রসনা হইয়া থাকি।" (অর্থাৎ কর্ণ তখন শরীয়ত বিরুদ্ধ বিষয় শ্রবণ করে না, চক্ষু নিষিদ্ধ দর্শন করে না এবং রসনা শরীয়ত বিরুদ্ধ কথা বলে না।) হযরত মূসা আলায়হিস সালামের উপর ওহী আসিল–"হে মূসা, আমি পীড়িত ছিলাম; তুমি আমাকে দেখিতে আস নাই কেন?' হযরত নিবেদন করিলেন-"হে আল্লাহ, তুমি সমস্ত বিশ্বজগতের মালিক এবং প্রভু; তুমি কিরূপে পীড়িত হইবে?" আল্লাহ্ বলিলেন–"অমুক বান্দা পীড়িত ছিল। দেখিতে গেলে যেন আমাকেই দেখিতে

যাওয়া হইত।" মোটকথা, আল্লাহ্‌র সহিত মানবের যে এক বিশেষ সামঞ্জস্য রহিয়াছে, ইহা সর্বসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া বড় দুষ্কর ব্যাপার।

উপরে যাহা বর্ণিত হইল তাহার উদ্দেশ্য এই যে, ভালবাসার কারণসমূহ যদি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পার, তবে বুঝিতে পারিবে, আল্লাহকে ভাল না বাসিয়া অপরকে ভালবাসিতে যাওয়া নিতান্ত মূর্খতার নিদর্শন। আর তর্কশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন–"সমজাতীয় না হইলে ভালবাসা স্থাপন করা যায় না। যেহেতু আল্লাহ আমাদের সমজাতীয় নহেন, কাজেই তাঁহার সহিত ভালবাসা স্থাপন সম্ভবপর নহে।" তাঁহাদের এই কথার উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের নামই তাঁহার প্রতি ভালবাসা। অনভিজ্ঞ তার্কিক পণ্ডিত বেচারাগণ ভালবাসা বলিতে স্ত্রী-পুরুষের কামভাব পূর্ণ ভালবাসা ব্যতীত আর কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, কামজ-ভালবাসা সমজাতীয়ত্বের উপর নির্ভর করে। কিন্তু যে ভালবাসার কথা আমরা বলিতেছি, তাহাতে আন্তরিক সৌন্দর্য ও পূর্ণত্বের প্রয়োজন–আকৃতিগত স্বজাতীয়ত্বের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই্ কারণ, যাহারা পয়গম্বরগণকে ভালবাসে, তাহারা এইজন্য ভালবাসে না যে, তাহার ন্যায় পয়গম্বরগণের হস্ত, পদ ও বদনমণ্ডল আছে; বরং এইজন্য লোকে পয়গম্বরগণকে ভালবাসে যে, তাঁহাদের আন্তরিক সদ্‌গুণরাজির সহিত লোকের আন্তরিক গুণের সাদৃশ্য আছে। কেননা তাহারাও পয়গম্বরগণের ন্যায় জ্ঞান রাখে, ইচ্ছা করিয়া থাকে, কথা বলিতে ও শুনিতে পারে এবং দেখিতে পারে। তবে পয়গম্বরগণের এই সমস্ত শক্তি বা গুণ নিতান্ত উন্নত। সাধারণ মানবের মধ্যেও এই মৌলিক গুণরাজি বিদ্যমান আছে, সুতরাং সাদৃশ্যও আছে। কিন্তু তাঁহাদের ও সাধারণ মানবের ঐ সকল গুণরাজির মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে। পয়গম্বরগণ এত অধিক উন্নত গুণের অধিকারী হওয়াতে সাধারণ লোক হইতে তাঁহাদের মর্যাদার দূরত্ব ঘটিয়াছে বটে কিন্তু সাদৃশ্যের কারণে যে-ভালবাসা জন্মে, এই দূরত্বের দরুন তাহা হ্রাস পায় না; বরং তাহাতেই ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। এতটুকু সাদৃশ্য সকলেই স্বীকার করে ও বুঝিতে পারে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, সকলে এই সাদৃশ্যের রহস্য ও হাকীকত হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় না।

আল্লাহ্‌র দীদার সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক–সকল মুসলমানের মুখেই শুনা যায় যে, আল্লাহ্‌র দীদারের (প্রত্যক্ষ দর্শনের) ন্যায় আনন্দদায়ক আর কিছুই নাই। কিন্তু আপন মনে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে না যে, যে-পদার্থ অনন্ত , কোন দিক বা অভিমুখের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, এবং যাহার কোন আকার ও বর্ণ

নাই, তাহাতে কি আনন্দ পাওয়া যাইতে পারে? তবে বিষয়টি শরীয়তে বর্ণিত আছে বলিয়া সকলেই ইহা মুখে মানিয়া লয়। সুতরাং এমন লোকের মনে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা জন্মিতে পারে না। কারণ, মানুষ যে-বস্তু জানে না তৎপ্রতি কিরূপে তাহার ভালবাসা জন্মিতে পারে? যাহাই হউক, এ-বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বড় দুষ্কর। তথাপি এ-স্থলে ইঙ্গিতে বর্ণিত হইবে।

আল্লাহ্‌র দীদার সম্ভবপর বুঝিবার জন্য চারিটি মূল তথ্য–আল্লাহ্‌র দীদার যে সম্ভবপর ইহার বিচার চারিটি মূল তথ্য-জ্ঞানের উপর নির্ভর করে; যথাঃ– (১) আল্লাহ্‌র দীদার (প্রত্যক্ষ দর্শন) আল্লাহ্‌র মা'রিফাত (পরিচয়-জ্ঞান) অপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক; (২) আল্লাহ্‌র পরিচয়-জ্ঞান অপর পদার্থের পরিচয়-জ্ঞান অপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক। (৩) চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় আনন্দ না পাইলেও মানব হৃদয় ইলম ও পরিচয়-জ্ঞানে আনন্দ পাইয়া থাকে এবং (৪) হৃদয় জ্ঞান হইতে যে আনন্দ পাইয়া থাকে, তাহা চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়লব্ধ আনন্দ হইতে অধিক সুখকর, প্রবল এবং বলবান। মানুষ যখন এই চারিটি মূল তথ্য জানিতে পরিবে তখন অবশ্যই সে বুঝিতে পারিবে যে, অন্য কোন পদার্থই আল্লাহ্‌র দীদার অপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক নহে।

প্রথম মূল তথ্য–পরিচয়ে হৃদয় আনন্দ পাইয়া থাকে; দেহ এই আনন্দের অংশ পায় না। মানবের মধ্যে আল্লাহ্ বহু শক্তি সৃজন করিয়াছেন এবং ইহাদের প্রত্যেকটিকে ভিন্ন ভিন্ন কার্যের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। যে-কাজের জন্য যে-শক্তি সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই ইহার স্বভাবসুলভ এবং স্বভাবসুলভ বস্তুতেই ইহার আনন্দ। যেমন প্রভুত্ব ও সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ক্রোধ-শক্তিকে সৃজন করা হইয়াছে। ক্রোধ এই কার্যের আনন্দ পায়। খাদ্য ও ভোগ্যবস্তু সংগ্রহের জন্য লোভকে সৃজন করা হইয়াছে এবং ভোগ্যবস্তু সংগ্রহেই ইহার তৃপ্তি। তদ্রূপ শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি এবং অপরাপর শক্তি নিজ নিজ কার্য করিয়া বিভিন্ন প্রকার আনন্দ পাইয়া থাকে। প্রত্যেক শক্তির আনন্দ পৃথক পৃথক। কারণ কাম-প্রবৃত্তির আনন্দ এবং ক্রোধ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করণের আনন্দ এক নহে। আবার শক্তির তারতম্যানুসারে আনন্দের তরতম্য হইয়া থাক। কোন আনন্দ অত্যন্ত প্রবল, আবার কোনটি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। এইজন্য সুগন্ধি আঘ্রাণে লোকে যে-আনন্দ পায় তদপেক্ষা রমণীয় আকৃতি দর্শনের আনন্দ প্রবল হইয়া থাকে। মানব মনে আল্লাহ এক শক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাই জ্ঞানালোক। বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা যে-

সকল বস্তু জানা যায় না তৎসমুদয়ের পরিচয় লাভের জন্য এই জ্ঞানালোকের সৃষ্টি হইয়াছে। জ্ঞানালোক ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুসমূহের পরিচয় লাভ করিয়া থাকে। বুদ্ধিবলে মানুষ জানিতে পারুক যে, এই বিশাল বিশ্বজগতের অশ্যই একজন পরমকৌশলী সর্বশক্তিমান নিয়ন্তা বিদ্যমান আছেন। ইহাতেই উহার আনন্দ। সৃষ্ট পদার্থে ও কারুকার্যের মধ্যে যে কৌশল বিদ্যমান আছে তাহা জ্ঞানালোক অবগত হইতে পারে; কিন্তু কোন বাহ্য ইন্দ্রিয় এই জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

আবার এই মানুষ বিভিন্ন প্রকারে সূক্ষ্মজ্ঞান লাভ করিলে পারে এবং এক জ্ঞানের সহিত অপর জ্ঞান মিলাইয়া নূতন জ্ঞান চয়নে সমর্থ হয়; যেমন–অভিধান প্রণয়ন, গ্রন্থ রচনা, অঙ্কশাস্ত্র আবিষ্কার এবং নূতন নূতন সূক্ষ্ম তথ্যের আবিষ্কার। এই সমস্ত কার্যেই বুদ্ধি আনন্দ পায়। এমন কি, তুচ্ছ বিষয়ে জ্ঞানের পারদর্শিতার জন্য প্রশংসা করিলেও লোকে আনন্দ পায়। আবার যদি বল—তুমি ইহা জান না, তবে সে দুঃখিত হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে লোকে নিজ ইলমকে পূর্ণ বলিয়া মনে করে। পাশা খেলায় অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে খেলার চাল বলিয়া দিতে নিষেধ করত বহু শর্তাধীনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়াও যদি তাহাকে খেলার মজলিসে বসিতে দাও তথাপি সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে না। পাশা খেলার ন্যায় হীন কার্যের জ্ঞান যে তাহার আছে, এই আনন্দে বিভোর হইয়া সে নীরব থাকিতে পারে না, বরং আত্মগর্ব প্রকাশ করিবার জন্য অধীর হইয়া ওঠে। এমতাবস্থায় ইলমের কারণে মানুষ আনন্দিত ও গর্বিত হইবে না কিরূপে? কেননা, ইলম আল্লাহ্‌র একটি গুণ। ইলমের পূর্ণতা অপেক্ষা অধিক আনন্দের মানুষের আর কি থাকিতে পারে? যে ইলম আল্লাহ্‌র গুণ হইতে লব্ধ, কোন্ পদার্থ তদপেক্ষা অধিক গৌরবের বস্তু।

এই মূল তথ্য হইতে জানা গেল যে, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় আনন্দ না পাইলেও মন ইলম হইতে আনন্দ পাইয়া থাকে।

দ্বিতীয় মূল তথ্য—মন ইলম ও পরিচয় জ্ঞান হইতে যে আনন্দ পায়, তাহা ইন্দ্রিয়লব্ধ ও কামলোভাদি প্রবৃত্তি চরিতার্থজনিত আনন্দ অপেক্ষা অধিক প্রবল। দেখ, পাশা ক্রীড়াসক্ত ব্যক্তি খেলায় প্রবৃত্ত হইলে সারাদিন অনাহারে কাটায়। তাহাকে খাইতে বলিলে সে শুনে না এবং খেলায় বিভোর থাকে। ইহাতে বুঝা যায় যে, খেলায় জয়ী হওয়া ও প্রতিপক্ষকে পরাজিত করিবার আনন্দ আহারের আনন্দ অপেক্ষা অধিক প্রবল। কারণ, সে পাশা খেলাকে আহার গ্রহণের উপর অগ্রাধিকার দিয়া রাখিয়াছে। দুইটি কার্যের মধ্যে কোন্‌টি অধিক আনন্দ দেয়,

জানিতে হইলে উভয় কার্যকে মনের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেখিতে হয়। যাহার দিকে মন অধিক আকৃষ্ট হয়, তাহাই অধিক আনন্দদায়ক। যে-কার্যে মানসিক শক্তি চরিতার্থ হয়, তাহাতেই বুদ্ধিমান ব্যক্তি অত্যধিক আনন্দ পাইয়া থাকে। কারণ, যদি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে ক্ষমতা দেওয়া হয় যে, সে সুমিষ্ট হালুয়া ও সুপক্ব গোশ্ত আহার করিবে, না এমন কার্য করিবে যাহাতে দুশ্মন পরাজিত হয় এবং এক বিরাট রাজত্ব হস্তগত হয় তবে সে বালকের ন্যায় অবোধ না হইলে বা তাহার বুদ্ধি একেবারে বিনষ্ট না হইয়া গেলে অথবা সে পাগল না হইয়া থাকিলে অবশ্যই সে বিজয় ও রাজত্বই গ্রহণ করিবে। অবোধ বালক ও বুদ্ধিবিনষ্ট পাগলের কথাই স্বতন্ত্র। সুতরাং যাহার মনে আহারের লোভ ও রাজকীয় সম্মান-লিপ্সা উভয়ই বর্তমান আছে, সে রাজসম্মান লাভের উপায় অবলম্বন করিবে। ইহা হইতে নিঃসন্দেহে বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞানসম্ভূত আনন্দ অপর সকল আনন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তদ্রূপ যে সকল ব্যক্তি গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা বা ধর্মবিধান ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন তাঁহারা উহাতে এক প্রকার আনন্দ পাইয়া থাকেন। আবার এই সকল বিদ্যায় তাঁহারা পরিপক্ব হইয়া থাকিলে উহাতেই তাঁহারা সর্বাধিক আনন্দ পাইয়া থাকেন। এমন কি, এই জ্ঞানসম্ভূত আনন্দকেই তাঁহারা রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালনার আনন্দের উপর অগ্রাধিকার দিয়া থাকনে। কিন্তু যাহাদের জ্ঞান অপরিপক্ব বলিয়া তদ্রূপ আনন্দ পায় না, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

জ্ঞানের আনন্দ অন্যান্য সকল আনন্দ অপেক্ষা কত অধিক, তাহা উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায়। কিন্তু অপরিপক্বতা থাকিলে তদ্রূপ আনন্দ পাওয়া যায় না। মানবের মধ্যে একদিকে যেমন বাঁশী বাজাইবার স্পৃহা রহিয়াছে, অপরদিকে তেমনি স্ত্রীসম্ভোগ, রাজকীয় ক্ষমতা লাভের খাহেশও আছে। যদি কোন অপরিণত বয়স্ক বালক স্ত্রীসম্ভোগ ও রাজকীয় ক্ষমতা লাভের আনন্দ অপেক্ষা বাঁশী বাজাইবার আনন্দের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়, তবে আমাদের প্রতিপাদ্য উক্ত সত্যটিতে কোন সন্দেহের উদ্রেক হয় না। কারণ, বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই বলিয়াই বাঁশি বাজাইবার দিকে অধিক ঝুঁকিয়া পড়ে; কেননা তাহার হৃদয়ে এখনও কামভাব ও রাজত্ব-লিপ্সা জাগ্রত হয় নাই। শেষোক্ত দুইটি বাসনা জাগিয়া উঠিলে নিশ্চয়ই সে ইহাদের প্রতিই অধিক আকৃষ্ট হইত।

তৃতীয় মূল তথ্য– আল্লাহ্‌র পরিচয়-জ্ঞান সকল জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞান নিতান্ত আনন্দদায়ক। ইহাতেও কোন সন্দেহ

নাই যে, এক জ্ঞান অপর জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, জ্ঞাতব্য বিষয় যত উৎকৃষ্ট, ইহার জ্ঞানও তত উৎকৃষ্ট। পাশা খেলার পদ্ধতি আবিষ্কার কার্য, ইহার খেলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, রাজ্য শাসনের জ্ঞান কৃষিকার্য ও সেলাই কার্যের জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ধর্ম-বিধান ও ইহার গুপ্ত রহস্যের জ্ঞান জ্যোতির্বিদ্যা ও ভাষা-জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মন্ত্রীদের কার্যের জ্ঞান নিম্নশ্রেণীর লোক ও লম্পটদের কার্যের জ্ঞান অপেক্ষা গৌরবজনক। রাজকার্যের জ্ঞান মন্ত্রীর কার্যের জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ফলকথা এই যে, জ্ঞাতব্য বিষয় যত শ্রেষ্ঠ হইবে, ইহার জ্ঞানও তত আনন্দদায়ক হইবে।

প্রিয় পাঠক, একটু ভাবিয়া দেখ–এই বিশ্বজগতের সকল পূর্ণতা এবং সমস্ত সৌন্দর্য একমাত্র আল্লাহই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ ও মহৎ এই বিশ্বজগতে অন্য কিছু আছে কি? আকাশ-পাতাল জুড়িয়া, ইহকাল পরকাল ব্যাপিয়া সুশৃঙ্খল ও ন্যায়বিচারের সহিত অপ্রতিহতভাবে তাঁহার যে বাদশাহী চলিয়াছে, দুনিয়ার কোন রাজার রাজ্যে তদ্রূপ চলিতেছে কি? আবার অপর কাহারও দরবার তাঁহার দরবার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও পূর্ণতর আছে কি? আল্লাহ্ যাহাদিগকে তাঁহার অসীম রাজত্বের অবস্থা দর্শনের জন্য চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার রাজকীয় গোপন রহস্য যাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা কিরূপে ভূতলের রাজার রাজকীয় গুপ্ত রহস্যকে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিতে পারে এবং আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর রাজ্যের দৃশ্যের প্রতি দৃকপাত না করিয়া অন্য কোন দৃশ্যের দিকে মনোনিবেশ করিতে পারে?

এই সমস্ত কথা হইতে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও গুণাবলী এবং তাঁহার রাজত্ব ও তদন্তর্গত গোপন রহস্য বিষয়ের জ্ঞান সর্ববিধ জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; কেননা, এই সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ই অতীব মহত্তর। বরং এইগুলিকে মহত্তর বলাও অন্যায়। কারণ, দুই পদার্থের মধ্যে তুলনা করিয়া একটি মহৎ হইলে অপরটিকে মহত্তর বলা হয়। আল্লাহ্ ও আল্লাহ্ সম্বন্ধীয় ব্যাপারের সহিত তুলনায় অপর কোন কিছুকেই মহৎ বলা যাইতে পারে না। এমতাবস্থায় আল্লাহকে কিরূপে মহত্তর বলা সঙ্গত হইবে? বরং তিনি অতুলনীয়, অতি উচ্চ, অতি মহান। সুতরাং প্রকৃত আরিফ (চক্ষুষ্মান ব্যক্তি) এই নশ্বর জগতে থাকিয়াও এমন এক বেহেশতে বিচরণ করিতে থাকেন যাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ –

অর্থাৎ "গননমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বিস্তৃতির ন্যায় ইহার বিস্তৃতি (সূরা হাদীদ, ৩ রুকূ, ২৭ পারা।) বরং ইহার বিস্তৃতি তদপেক্ষা অধিক। কারণ, আকাশ-পাতালের বিস্তৃতির সীমানা আছে; কিন্তু মারিফাতের কোন পরিসীমা নাই। ইহা আরিফের মনোরম উদ্যানসদৃশ। আকাশ-পাতালের পরিসীমা আছে; কিন্তু ইহার কোন পরিসীমা নাই। এই উদ্যানের ফল অফুরন্ত ও অটুট এবং ইহা উপভোগে আরিফকে কেহই বাধা দেয় না; যেমন আল্লাহর বলেন ঃ – قُطُوْفُهَا دَانِيَةٌ

অর্থাৎ "আর ইহার ফলগুলি অতি নিকটবর্তী (সহজপ্রাপ্য)।" (সূরা আলহাক্কাহ, ১ রুকূ, ২৯ পারা।) নিকটবর্তী বলার উদ্দেশ্য এই যে, আরিফগণের মনে মারিফাতের সুরসাল ফল বিরাজমান থাকে এবং মনের মধ্যে যাহা থাকে তদপেক্ষা নিকটবর্তী আর কি হইতে পারে? এই বেহেশতে কোন প্রকার বাধা-নিষেধ ও হিংসা-বিদ্বেষ নাই। কারণ, তত্ত্বদর্শন ক্ষেত্রে যাহার যত বেশী জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, সে তত বেশী আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। আর এই খোদা পরিচিতির বেহেশত এরূপ যে, লোকসংখ্যা যতই অসীম হউক না কেন, ইহাতে স্থানের অপ্রতুলতা কখনও ঘটে না। বরং লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বেহেশতের পরিসরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

চতুর্থ মূল তথ্য– আল্লাহ্‌র জ্ঞান অপেক্ষা আল্লাহ্‌র দীদার (দর্শন) উৎকৃষ্ট। জ্ঞান দুই প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার কেবল খেয়ালে আসে; যেমন–বর্ণ ও আকৃতি। অপর প্রকার খেয়ালে আসে না, জ্ঞানবলে পাওয়া যায়; যথা–আল্লাহ্ ও তাঁহার গুণাবলী। এমন কি, মানবের কতকগুলি গুণও আমাদের খেয়ালে আসে না; যেমন, ক্ষমতা, ইচ্ছা, জীবন। কারণ, এই সমস্ত কি প্রকার, ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। তদ্রূপ ক্রোধ, প্রেম, বাসনা, কামনা, সুখ-দুঃখ কেমন বস্তু, তাহাও বুঝাইয়া বলা চলে না। এই সকল কেবল জ্ঞানালোকের সাহায্যেই বুঝিয়া লইতে হয়। অপরপক্ষে যে-বস্তু খেয়ালে আসে, তাহা লোকে দুই প্রকারে জানিতে পারে। প্রথম প্রকার–বস্তুটি যেন লোকে দেখিতেছে এমনভাবে ইহাকে খেয়ালের সম্মুখে রাখিয়া বুঝিয়া লওয়া হয়। সুতরাং এই উপায়লব্ধ জ্ঞান নিতান্ত অসম্পূর্ণ। দ্বিতীয় প্রকার–বস্তুটি বাস্তবচক্ষে দর্শন করা হয়। জ্ঞানলাভের এই পদ্ধতি প্রথম প্রকারের পদ্ধতি অপেক্ষা পূর্ণতর। এইজন্যই প্রিয়জনকে খেয়ালের

চক্ষে দর্শন করিলে যে-আনন্দ অনুভব হয় স্বচক্ষে দর্শন করিলে তদপেক্ষা অধিক আনন্দ পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই নহে যে, খেয়ালের চক্ষে যে আকৃতি নয়নগোচর হইয়াছিল, ইহা হইতে ভিন্ন বা উৎকৃষ্ট কোন আকৃতি স্বচক্ষে দর্শনের সময় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। তবে কথা এই যে, স্বচক্ষে দর্শনের সময় ঐ একই আকৃতি অধিক উজ্জ্বলভাবে দেখা দিয়া থাকে। যেমন, কোন প্রেমিক তাহার প্রিয়জনকে ঊষার অন্ধকারে দেখিলে যেরূপ আনন্দ পায়, দিন চড়িলে রৌদ্রের আলোকে দেখিলে তদপেক্ষা সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় বলিয়া সে পূর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইয়া থাকে। ইহার কারণ এই নহে যে, দিনমানে আকৃতিতে কোন পরিবর্তন সাধিত হয়; বরং কারণ এই য, দিবাভাগে রৌদ্রের আলোকে পূর্ব আকৃতিই অধিক উজ্জলভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

তদ্রূপ যে বস্তু খেয়ালে আসে না, কেবল জ্ঞানবলে জানা যায়, তাহাও জানিবার দুই প্রকার উপায় আছে। প্রথমটি মারিফাত এবং দ্বিতীয়টি ইহারও এক সোপান ঊর্ধ্বে; ইহাকে দীদার বলে। চরম বিকাশের দিক দিয়া বলিতে গেলে খেয়াল ও দর্শনের মধ্যে যে-পার্থক্য রহিয়াছে, মারিফাত ও দীদারের মধ্যেও তদ্রূপ পার্থক রহিয়াছে। আবার দর্শন অপেক্ষা খেয়াল অস্পষ্ট হইলেও দর্শনে প্রতিবন্ধকতা আছে, কিন্তু খেয়ালের পথ সর্বদা উন্মুক্ত থাকে; যেমন–চক্ষুর পলক বন্ধ করিলে দর্শনে বাধা পড়ে এবং পুনরায় চক্ষু না খুলিলে দেখা যায় না। এইরূপ, প্রত্যক্ষ দর্শন অপেক্ষা মারিফাত অস্পষ্ট হইলেও অবস্থা বিশেষে বাধা পড়িয়া প্রত্যক্ষ দর্শনের পথ বন্ধ হইয়া যায়; পুনরায় প্রতিবন্ধকতা বিদূরিত না হইলে প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করা যায় না। কিন্তু মারিফাতের পথ কখনও বন্ধ হয় না। যে-পানি ও মাটি হইতে মানবদেহ নির্মিত, উহার সহিত তাহার সম্বন্ধ এবং দুনিয়ার লোভ-লালসায় লিপ্ততা প্রত্যক্ষ দর্শনের পথে তাহার পক্ষে এক দুর্ভেদ্য অন্তরায়। এই অন্তরায় বিদূরিত না হইলে দীদারও লাভ করা যায় না। এইজন্যই হযরত মূসা আলায়হিস সালামকে আল্লাহ বলেন – لَنْ تَرَانِيْ অর্থাৎ "তুমি কখনও আমাকে দেখিতে পাইবে না।" (সূরা আ'রাফ, ১১ রুকূ, ৯ পারা।)

যাহাই হউক, খেয়ালের তুলনায় দীদারের আনন্দ যেমন নিতান্ত অধিক তদ্রূপ দীদার যখন মারিফাত অপেক্ষা উজ্জ্বল ও পূর্ণ তখন তাহা হইতে লব্ধ আনন্দও যে অত্যন্ত বেশী ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মা'রিফাতের পূর্ণ বিকাশই দীদার–শুক্রবিন্দু যেমন পরিশেষে মানবমূর্তি ধারণ করে বীজ বৃক্ষে পরিণত হয় তদ্রূপ মা'রিফাতও কিয়ামত দিবসে অন্য অবস্থা ধারণ করিবে এবং আদিম অবস্থার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না। তখন ইহার পূর্ণ উন্নতি বিকাশ পাইবে এবং ক্রমোন্নতির বিবর্তনে ইহা নিতান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। ইহাকেই দীদার বা প্রত্যক্ষ দর্শন বলে। কারণ, দীদারের অর্থ হইল পূর্ণরূপে অনুধাবন করা এবং আল্লাহ্‌র দর্শনই পূর্ণরূপে অনুধাবন করার চরম সোপান। ইহকালে মা'রিফাত যেমন কোন দিক বা অভিমুখের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ার মুখাপেক্ষী নহে, তদ্রূপ পরকালে দীদারও কোন দিক বা অভিমুখের মুখাপেক্ষী নহে। সুতরাং মা'রিফাতই দীদারের বীজ। যে-ব্যক্তি মা'রিফাত লাভ করে নাই, সে চিরদিন আল্লাহ্‌র দীদার হইতে বঞ্চিত থাকিবে। কেননা, যে-ব্যক্তি বীজই বপন করে নাই, সে শস্য লাভ করিবে কিরূপে? যে-ব্যক্তি যত বড় আরিফ হইবেন, তাঁহার দীদারও তত পূর্ণ হইবে।

মনে করিও না যে, সকলেই দীদারের আনন্দ সমানভাবে উপভোগ করিবে; বরং প্রত্যেকেই নিজ নিজ মা'রিফাত অনুযায়ী দীদার লাভ করিবে। যেমন, হাদীস শরীফে আছে–"নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বীয় জ্যোতি সকল মানুষের উপর সাধারণভাবে প্রকাশ করিবেন; কিন্তু আবূ বকরের (রা) উপর বিশেষভাবে প্রকাশ করিবেন।" এই হাদীসের মর্ম ইহা নহে যে, হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু একবার একাকী আল্লাহকে দর্শন করিবেন এবং অন্যান্য সকলে একত্রে একবার তাঁহাকে দর্শন করিবে। বরং সকলেই একত্রে আল্লাহকে দেখিতে পাইবে, কিন্তু হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু যে-বিশেষ দর্শন লাভ করিবেন, ইহা হইতে অপর সকল লোক বঞ্চিত থাকিবে। হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু মা'রিফাতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই তিনি বিশেষ দীদার লাভ করিবেন। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অন্যত্র বলেন যে, অতিরিক্ত নামায-রোযার কারণে অপর সাহাবীগণের উপর আবূ বকরের (র) অধিক ফযীলত নাই; বরং তাঁহার অন্তর্নিহিত এক গোপন রহস্যের কারণে সকলের উপর তাঁহার ফযীলত রহিয়াছে। এই উক্তিতেও হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হু যে মা'রিফাতে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন তৎপ্রতিই ইঙ্গিত রহিয়াছে। এই মা'রিফাতের কারণেই তিনি আল্লাহ্‌র বিশেষ দীদার লাভ করিবেন।

আল্লাহ্ এক ও অভিন্ন হইলেও মা'রিফাতের তারতম্য অনুসারে দীদারে

পার্থক্য ঘটিবে। একই পদার্থের ছবি যেমন পৃথক পৃথক দর্পণে বিভিন্ন রূপ দেখা যায় ইহাও ঠিক তদ্রূপ। কোন দর্পণে ক্ষুদ্র, কোনটিতে সরল, আবার কোনটিতে বা বক্র দেখা যায়। এমন কি বক্রতায় কোন কোন সময় এতটুকু যাইয়া পৌঁছে যে, সুন্দর মূর্তিও নিতান্ত কুৎসিত বলিয়া মনে হয়। যেমন সুন্দর মূর্তির ছবি পরিষ্কার দর্পণে সুন্দরই দেখায়; কিন্তু তলওয়ারের পাতের উপর দেখিতে গেলে নিতান্ত কুৎসিত দেখা যায়। যে-ব্যক্তি নিজের হৃদয়রূপ দর্পণ এই জগত হইতে মলিন বা বক্র করিয়া লইয়া পরলোকে গমন করে, তাহার হৃদয়-ফলকে আল্লাহর দীদার ঠিকভাবে প্রতিফলিত হইবে না এবং তজ্জন্য যে-দীদার অপরের জন্য অসীম আনন্দদায়ক হইবে, ইহাই তাহার জন্য অসীম কষ্ট ও যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিবে।

মহব্বতের তারতম্যানুসারে দীদারের আনন্দে তারতম্য–পয়গম্বরগণ আল্লাহ্‌র দীদারে যেরূপ আনন্দ উপভোগ করিবেন অপর লোকেও তদ্রূপ আনন্দ পাইবে, ইহা মনে করিও না। আর ইহাও ধারণ করিও না যে, আলিমগণ যে আনন্দ পাইবেন সাধারণ লোকেও সেই আনন্দ পাইবে এবং খোদাভীরু ও আল্লাহ-প্রেমিক আলিমগণ যেরূপ আনন্দ লাভ করিবেন, সাধারণ আলিমগণও তদ্রূপ আনন্দ পাইবেন। যে আরিফের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং যে আরিফের অন্তরে মহব্বত তত প্রবল হইয়া উঠে নাই, তাঁহাদের দীদারের আনন্দও তদ্রূপ পার্থক্য হইবে। দীদারের তারতম্যানুসারে এই প্রার্থক্য হইবে না, কেননা উভয় আরিফ এক আল্লাহ্‌কেই দেখিবেন। তবে দীদারের মূল কারণ মা'রিফাতে সমান হইলেও মহব্বতের তারতম্যে তাঁহাদের দীদারের আনন্দে তারতম্য হইবে। এই দুই জন আরিফের দৃষ্টান্ত এই যে, মনে কর দুইজন লোকের দর্শনশক্তি সমান প্রখর। তাহারা উভয়ে একজন সুন্দর ব্যক্তি দেখিতে পাইল। তাহাদের একজন এই সুন্দর ব্যক্তিকে ভালবাসে, কিন্তু অপরজন তাহাকে ভালবাসে না। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি তাহাকে ভালবাসে সে অবশ্যই তাহাকে দেখিয়া অধিক আনন্দ পাইবে। আবার মনে কর উভয় দর্শকই সেই সুন্দর ব্যক্তিকে ভালবাসে। কিন্তু তন্মধ্যে একজন তাহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত পড়িয়াছে এবং অন্যজন তত আসক্ত হয় নাই। এমন স্থলে যে-ব্যক্তি অধিক আসক্ত সে-ই মাশুক দেখিয়া অধিক আনন্দ লাভ করিবে।

উপরিউক্তি বর্ণনা হইতে বুঝা গেল যে, পরকালে চরম সৌভাগ্য লাভের জন্য কেবল মা'রিফাতই যথেষ্ট নহে; বরং মা'রিফাতের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে

আল্লাহ্‌র মহব্বতও প্রবল করিয়া তুলিতে হইবে। আল্লাহ্-প্রেম এমন প্রবল করিয়া তুলিতে হইবে যেন ইহার প্রভাবে মানব হৃদয় দুনিয়ার মহব্বত হইতে একেবারে পাক-পবিত্র হইয়া পড়ে। সংসার-বিরাগ ও পরহেযগারী ব্যতীত অন্তরের এইরূপ পবিত্রতা হাসিল হয় না। সুতরাং সংসার-বিরাগী ও আল্লাহ্-প্রেমিক আরিফই দীদারের পূর্ণ আনন্দ লাভ করিবেন।

মা'রিফাতের আনন্দ অপেক্ষা দীদারের আনন্দ অত্যধিক–তুমি হয়ত বলিতে পার যে, দীদারের আনন্দ মা'রিফাতের আনন্দের সমজাতীয় না হইলে ইহা কোন আনন্দই নহে। মা'রিফাতের আনন্দ সম্বন্ধে তোমার অজ্ঞতাই এইরূপ উক্তির একমাত্র কারণ। তুমি হয়ত মা'রিফাত সম্বন্ধে কিছু কথা কোন কিতাবে একত্র সম্বলিত দেখিয়া মুখস্থ করিয়া লইয়াছ অথবা কাহারও নিকট হইতে কথাগুলি শিক্ষা করিয়া এইগুলির নাম রাখিয়াছ 'মা'রিফাত'। তাহা হইলে তুমি মা'রিফাতের আনন্দ পাইবে না। চাউল ভাজাকে সুমিষ্ট হালুয়া নাম দিয়া খাইতে থাকিলে উহাতে কখনই হালুয়ার স্বাদ পাওয়া যাইবে না। যে-ব্যক্তি মা'রিফাতের আস্বাদ লাভ করিয়াছেন তাঁহাকে ইহার বিনিময়ে দুনিয়াতেই বেহেশ্‌ত দিতে চাহিলে তিনি উহা গ্রহণ করিতে চাহিবেন না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেমন রাজত্ব পাওয়ার আনন্দকে উদর তৃপ্তির সুখ বা কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার আনন্দ অপেক্ষা অধিক পছন্দ করিয়া থাকে তদ্রুপ জ্ঞানী লোকেরাও মা'রিফাতের আনন্দকে এই দুনিয়াতে বেহেশ্‌ত লাভের আনন্দ অপেক্ষা অধিক পছন্দ করিয়া থাকেন। মা'রিফাতের আনন্দ এত অধিক হইলেও আল্লাহ্‌র দীদারের আনন্দের সহিত কোন তুলনাই চলে না।

দৃষ্টান্ত ব্যতীত একথা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না। মনে কর, মা'শূকের প্রতি আশিকের প্রেম এখনও তত গাঢ় হইয়া উঠে নাই এবং তাহার দিকে আশিকের আকর্ষণও নিতান্ত কম। অপর দিকে কতকগুলি ভীমরুল ও বিচ্ছু আশিকের পরিহিত বস্ত্রে থাকিয়া তাহাকে অনবরত দংশন করিতেছে। এই সমস্ত কষ্ট সত্ত্বেও তাহাকে আরও কতকগুলি কার্যে লিপ্ত থাকিতে হইয়াছে এবং সর্ব বিষয়ে সে ভীত সন্ত্রস্ত রহিয়াছে। এমন ব্যক্তি ঊষার প্রাক্কালে অন্ধকারের কিছু ঘোর থাকিতে মা'শূকের দর্শন লাভ করিলে তদ্রূপ অবস্থায় প্রিয়জন দর্শনের পূর্ণ আনন্দ অবশ্যই সে পাইবে না। কিন্তু তৎপর হঠাৎ যদি সূর্যোদয়ের ফলে চতুর্দিক আলোকিত হয়, তাহার প্রেম প্রবল বেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, কর্ম-ব্যাপৃতি ছিন্ন ও ভয় বিদূরিত হয় এবং ভীমরুল ও বিচ্ছুর দংশন-যন্ত্রণা

হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় তবে এমন ব্যক্তি ইতঃপূর্বে বিপদাপদে জড়িত থাকিয়া যে আনন্দ পাইয়াছিল, এই আনন্দের সহিত উহার কোন তুলনাই হইতে পারে না। দুনিয়াতে আরিফের অবস্থা ঠিক তদ্রূপ। অন্ধকারাচ্ছন্ন দুনিয়াতে মা'রিফাতের পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না বলিয়া আরিফের ইহলৌকিক দর্শনকার্য পর্দার অন্তরাল হইতে বাহিরে দর্শনের ন্যায় অস্পষ্ট। যে পর্যন্ত মানব ইহজগতে থাকে, সেই পর্যন্ত সে অপূর্ণ থাকে এবং তজ্জন্য তাহার আল্লাহ-প্রেম পূর্ণ বিকশিত হইতে পারে না বলিয়া দুর্বল থাকে। দুনিয়ার লোভ-লালসা, সাংসারিক শোক-দুঃখ ও ক্রোধ উপরিউক্ত ভীমরুল, বিচ্ছু ইত্যাদির দংশনজনিত যন্ত্রণাসদৃশ। কারণ, ইহাদের উৎপাতে মা'রিফাতের মাধুর্য হ্রাস পায়। জীবিকা সংগ্রহের কার্য ও এবংবিধ নানা ব্যাপারে মানুষ দুনিয়াতে কর্মব্যস্ত ও ভীত থাকে। মৃত্যু ঘটিলে এ সকল অন্তরায় ঘুচিয়া যায়। তখন দীদারের ইচ্ছা ও মহব্বত পূর্ণমাত্রায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে; জীবিতকালে যে সকল অবস্থা গোপন ছিল উহাও প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং সংসারের সকল জ্বালা-যন্ত্রণা বিদূরিত হয় ও কর্মব্যস্ততা ছিন্ন হইা যায়। এইজন্য দীদারের আনন্দ চরমে যাইয়া পৌঁছে। অবশ্য এই আনন্দ মা'রিফাতের তারতম্যানুসারেই হইয়া থাকে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি আহার্যদ্রব্যের আঘ্রাণে যে আনন্দ পায়, ইহার সহিত ভক্ষণজনিত আনন্দের যেমন কোন তুলনা চলে না, তদ্রূপ দীদারের আনন্দের সহিত মা'রিফাতের আনন্দেরও কোন তুলনা চলে না, অর্থাৎ খাদ্যদ্রব্য আঘ্রাণের আনন্দ অপেক্ষা ভক্ষণের আনন্দ যেমন অতীব অধিক, মা'রিফাতের আনন্দ অপেক্ষা দীদারের আনন্দও তেমনি অধিক।

সাধারণ দর্শন ও আল্লাহ্‌র দীদারে পার্থক্য— এ-স্থলে হয়ত বলিতে পার, মা'রিফাত হৃদয়ে জন্মে এবং চক্ষু দ্বারা দীদার লাভ হয়। সুতরাং দীদারের আনন্দ কিরূপে অধিক হইতে পারে? জানিয়া রাখ, পূর্ণ খেয়াল হইতে উদ্ভব হয় বলিয়াই দর্শনকে দীদার বলে। দর্শনকার্য চক্ষু দ্বারা সম্পন্ন হয় বলিয়াই ইহাকে দীদার বলে না; কারণ, আল্লাহ্ দীদার লাভের ক্ষমতা মস্তকে সৃজন করিয়া দিলেও দীদার লাভ হইত। কাজেই দীদারকে কোন নির্দিষ্ট অঙ্গের সহিত আটকাইয়া বুঝিতে যাওয়া অনর্থক পরিশ্রমমাত্র। কেননা 'দীদার' শব্দে শরীয়তে উক্ত হইয়াছে এবং প্রকাশ্যভাবে দীদার চক্ষু দ্বারাই লব্ধ হয় বলিয়া পরকালের দীদারের সহিতও চক্ষুর সংস্রব রহিয়াছে। আর ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, পরকালের চক্ষু দুনিয়ার চক্ষুর ন্যায় হইবে না। দিকের সঙ্গে দুনিয়ার চক্ষুর

দর্শনশক্তি সীমাবদ্ধ; কিন্তু পরকালের চক্ষুর দর্শনশক্তি তদ্রূপ সীমাবদ্ধ নহে। সকল দিকেই সেই চক্ষু দিয়া দেখা যাইবে।

এই বিষয়ে সর্বসাধারণের তর্ক-বিতর্ক ও বাদানুবাদ করা সঙ্গত নহে। কারণ, ইহা তাহাদের ক্ষমতা-বহির্ভূত। বানর দ্বারা সূত্রধরের কার্য সম্পন্ন হয় না। যে সকল আলিম কেবল ফিকাহ্ ও হাদীস-তফসীর অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাও একথা বুঝিতে পারেন না। এমন কি, তর্কশাস্ত্রাভিজ্ঞ আলিমগণও দীদারের হাকীকত উপলব্ধি করিতে অক্ষম। কেননা, তাঁহাদের কর্তব্য হইল জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভুলত্রুটি সংশোধন করা। বেদ'আতী লোকগণ নব নব প্রথা প্রচলনপূর্বক অজ্ঞ লোকদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল করিবার এবং সমাজদেহে নানারূপ অনিষ্ট ও ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়া থাকে। তর্কশাস্ত্রাভিজ্ঞ আলিমগণ এই সমস্তের প্রতিরোধ করেন। এবং ধর্ম-বিষয় লইয়া তর্ক-বিতর্ক করাকেই ইহার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মা'রিফাতের পথই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং এই পথের পথিকগণের স্বভাবও অন্য প্রকার। কবি বলেন–

منزل عشقش مکان دیگر ست ـ مردان راه اشان دیگر ست –

"অর্থাৎ আল্লাহ-প্রেমের পথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ঐ পথের পথিকদিগকে চিনিবার নির্দশন স্বতন্ত্র।" এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইহার বর্ণনা হইতে পারে না। সুতরাং এ-পর্যন্ত যাহা বলা হইল ইহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি।

দীদারের আনন্দ সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মাইবার উপায়–তুমি হয়ত বলিতে পার, যে-আনন্দ পাইলে বেহেশ্‌তের আনন্দের কথা লোকে ভুলিয়া যায়, ইহা আমি কোন প্রকারেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। এই সম্বন্ধে আলিমগণ বহু কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু ইহার আনন্দ ভাগ্যে না ঘটিলেও ইহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের উপায় কি, তাহা জানিয়া লওয়া আবশ্যক। এই বিশ্বাস জন্মাইবার তিনটি উপায় আছে।

প্রথম উপায়– দীদারের আনন্দ সম্বন্ধে যে সকর কথা উপরে বর্ণিত হইয়াছে তৎপ্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করা যেন ইহা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। কারণ, যে-কথা একবার মাত্র শুনা যায় তাহা অধিকক্ষণ মনে থাকে না।

দ্বিতীয় উপায়–মানবের সকল প্রবৃত্তি—আনন্দানুভব শক্তি ও কামভাব ইত্যাদি একবারে একই সময়ে বিকাশ পায় না। শিশুর হৃদয়ে সর্বপ্রথম আহার

প্রবৃত্তি এবং আহারজনিত আনন্দবোধের শক্তি জাগ্রত হয়। ইহা ছাড়া শিশু আর কিছু জানেই না। প্রায় সাত বৎসর বয়সের সময় তাহার মনে খেলাধুলার অভিলাষ বিকষিত হয় এবং এই অভিলাষ চরিতার্থ করিয়া সে আনন্দ উপভোগ করেন। এমন কি, তখন সে মুখের অন্ন ফেলিয়া দিয়া খেলা করিতে দৌড়ায়। বয়স দশ বৎসরের নিকটবর্তী হইলে সাজসজ্জা ও উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদের বাসনা তাহার মনে জাগরিত হয় এবং উহাতে সে আনন্দ অনুভব করে। এই বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সে খেলাধুলা পর্যন্ত পরিত্যাগ করে। পনের বৎসর বয়স হইতে রমণী-সম্ভোগের কামনা জাগিয়া উঠে এবং ইহাতে পরম আনন্দ অনুভব করে। এমন কি, তখন রমণীর পিছনে, পড়িয়া যথাসর্বস্ব বিসর্জন দেয়। তৎপর বয়স বিশ বৎসরের নিকটবর্তী হইলে প্রভুত্বপ্রিয়তা ও অহংকার বৃদ্ধি পায় এবং সম্মান-লিপ্সার আনন্দ মনে জাগ্রত হয়। ইহাই পার্থিব আনন্দের শেষ সোপান, যেমন আল্লাহর বলেন ঃ

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ –

অর্থাৎ "দুনিয়ার জীবন খেলা, তামাশা, শোভা সৌন্দর্যের আড়ম্বর তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অহংকারের অবলম্বন এবং ধনেজনে অন্য অপেক্ষা আধিক্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

তৎপর বয়স বিশ বৎসরের বেশী হইলে দুনিয়া যদি তাহার অন্তর একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়া না থাকে এবং তাহার হৃদয় পীড়িত করিয়া না থাকে তবে বিশ্বজগত, ইহার সৃষ্টিকর্তা এবং গগনমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের পরিচয় লাভের আনন্দ তাহার মনে জাগিয়া উঠে। আর পরবর্তী প্রতিটি আনন্দের তুলনায় পূর্ববর্তী সকল আনন্দ যেমন তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হয় তদ্রূপ এই পরিচয়-জ্ঞানের আনন্দের তুলনায় পূর্ববর্তী সকল আনন্দই নিতান্ত তুচ্ছ হইয়া পড়ে। বেহেশ্‌তের আনন্দ এবং উদর, কাম ও চক্ষু চরিতার্থজনিত আনন্দ উভয়ই সমশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, বেহেশতেও লোকে সুরম্য উপবনে বিহার, অতি উপাদেয় উপাদেয় আহার গ্রহণ এবং নির্মল সলিলা স্রোতস্বতী ও নানারূপ কারুকার্যখচিত উচ্চ উচ্চ সৌধরাজি দর্শনে আনন্দ লাভ করিবে। বেহেশ্‌তের এই আনন্দের তুলনায় এই দুনিয়ার রাজত্ব, প্রভাবপ্রতিপত্তি এবং শাসন-ক্ষমতা পরিচালনার আনন্দও তুচ্ছ হইয়া উঠে। এমতাবস্থায় মা'রিফাতজনিত আনন্দের

তুলচনায় এই সকল ইন্দ্রয়লব্ধ আনন্দ কত তুচ্ছ হইয়া পড়ে তাহা বলাই বাহুল্য। দেখ, খ্রীস্টান সন্ন্যাসী লোকের সম্মান পাইবার উদ্দেশ্যে কখন কখন নিজকে গীর্জায় আবদ্ধ করিয়া রাখে এবং প্রত্যহ অতি সামান্য পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে। অতএব দেখা গেল যে, সন্ন্যাসী বেহেশতের আনন্দ অপেক্ষা দুনিয়াতে লোকের নিকট সম্মান পাওয়ার আনন্দকে অধিক পছন্দ করে। কারণ, বেহেশতেও উদর, কাম এবং চক্ষু চরিতার্থজনিত আনন্দ রহিয়াছে। সুতরাং যে-ব্যক্তি পূর্বেই সকল ইন্দ্রয়লব্ধ আনন্দকে তুচ্ছ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছে, মা'রিফাতের আনন্দে তাহার অন্য সকল আনন্দই বিলীন হইয়া যাইবে।

প্রিয় পাঠক, এখন তুমি সম্মান ও প্রভুত্ব ভালবাসিবার বয়সে উপনীত হইয়াছ বলিয়া তুমি রাজত্ব ও রাজকীয় ক্ষমতাকে আনন্দদায়ক পদার্থ অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেছ। কিন্তু যে-বালক অদ্যাবধি রাজকীয় ক্ষমতার আনন্দ বুঝিতে পারে নাই সে ইহাতে বিশ্বাসী নহে এবং তুমি শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে রাজকীয় ক্ষমতার মাধুর্য বুঝাইতে পারিবে না। এইরূপ কোন আরিফ শত চেষ্টা করিয়াও এখন তোমার ন্যায় অন্ধকে মা'রিফাতের মাধুর্য বুঝাইয়া দিতে পারিবেন না। কিন্তু তোমাতে যদি কিছু মাত্র বুদ্ধি থাকে এবং তুমি গভীরভাবে মনোবিনেশ কর তবে মা'রিফাত যে সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক, তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে।

তৃতীয় উপায়–আরিফগণের অবস্থা অবলোকন করা এবং তাঁহাদের উক্তি শ্রবণ করা। কারণ, নপুংসক ও পুরুষত্বহীন লোক যদিও স্ত্রী-সম্ভোগের আনন্দ সম্বন্ধে কিছুই জানে না তথাপি তাহারা যখন দেখিতে পায় যে অন্য পুরুষগণ তাহাদের যথাসর্বস্ব রমণীর পিছে উড়াইয়া দিতেছে, তখন নপুংসক ও পুরুষত্বহীন লোকের মনে আপনা-আপনিই এ-কথা বোধগম্য হয় যে, স্ত্রীসহবাসে এমন আনন্দ নিহিত আছে যাহা তাহাদের অদৃষ্টে ঘটে না। হযরত রাবেয়ার (র) সম্মুখে লোকে বেহেশতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে তিনি বলিলেন–"সর্বপ্রথম গৃহস্বামী, তৎপরগৃহ।" হযরত সুলায়মান দারানী (র) বলেন–"আল্লাহ্‌র বান্দাগণের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক আছেন দোযখের ভয় ও বেহেশতের আশা যাঁহাদিগকে আল্লাহ্‌র যিকির হইতে বিরত রাখে না। এমতাবস্থায় দুনিয়া কিরূপে তাঁহাদিগকে আল্লাহ্‌র যিকির হইতে বিরত রাখিবে?" হযরত মারূফ কারখীকে (র) তাঁহার এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন–"বলুন ত, কোন্ পদার্থ আপনাকে দুনিয়া হইতে বিমুখ করিয়া ইবাদত ও

নির্জনবাসে লিপ্ত করিয়াছে? মৃত্যু-ভয়, কবরের ভীতি, দোযখের সংশয় বা বেহেশতের লোভ কি আপনাকে লিপ্ত করিয়াছে?" তিনি বলিলেন–"এগুলির কি হাকীকত আছে? যে বাদশাহর ক্ষমতার হস্তে এই সমস্ত আছে, তাঁহার সহিত মহব্বত রাখিলে এই সমস্তই ভুলিয়া যাও। তাঁহার পরিচয় পাইলে এবং তাঁহার সহিত ভালবাসা জন্মিলে ঐ সমস্তের জন্য তুমি লজ্জাবোধ করিবে।"

হযরত বিশ্‌রে হাফীকে (র) কেহ স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন– "আবূ নসর তাম্মার ও আবদুল ওহ্‌হাব দার্‌রাকের অবস্থা কেমন?" তিনি বলিলেন–'এখনই তাঁহাদিগকে বেহেশতে পানাহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া আসিলাম।" সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল–"আপনার অবস্থা কেমন?" তিনি বলিলেন–"আল্লাহ জানেন যে, পানাহারের প্রতি আমার মোটেই আগ্রহ নাই। তাই তিনি আমাকে তাঁহার দীদার দান করিয়াছেন।" হযরত আলী ইবনে মুয়াফ্‌ফক (র) বলেন–"আমি একবার স্বপ্নে বেহেশ্‌ত দেখিলাম –বহু লোক সেখানে আহারে প্রবৃত্ত ছিলেন এবং ফিরিশ্‌তাগণ উত্তম উত্তম খাদ্য তাঁহাদের মুখে তুলিয়া দিতেছিলেন। এক ব্যক্তিকে দেখিলাম আল্লাহ্‌র দিকে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া একদৃষ্টিতে হতভম্ব হইয়া চাহিয়া আছেন। আমি রেয্‌ওয়ানকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন–'তিনি মারূফ কারখী (র)। তিনি দোযখের ভয়ে বা বেহেশ্‌তের আশায় ইবাদত করেন নাই। এইজন্য আল্লাহ্ স্বীয় দীদার দ্বারা তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।" হযরত আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন–"যে ব্যক্তি আজ নিজকে লইয়া ব্যাপৃত সে কাল কিয়ামত দিবসও নিজকে লাইয়াই ব্যাপৃত থাকিবে; আর যে-ব্যক্তি অদ্য আল্লাহকে লইয়া ব্যাপৃত সে কাল কিয়ামত দিবসও আল্লাহকে লইয়া ব্যাপৃত থাকিবে।"

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মু'আয (র) বলেন–"এক রজনীতে দেখিলাম হযরত বায়েযীদ (র) পায়ের গোড়ালি উত্তোলনপূর্বক উভয় পায়ের অঙ্গুলির উপর উপবেশ করিয়া ঈশার নামাযের পর প্রভাত পর্যন্ত কাটাইলেন। অবশেষে সিজদা করিয়া পরে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং মুখ আকাশের দিকে তুলিয়া মুনাজাত করিতে লাগিলেন–"হে আল্লাহর, কত লোক তোমার অনুসন্ধান করিয়াছেন। তুমি তাঁহাদিগকে এই কারামত দান করিয়াছ যে, তাঁহারা পানি উপর দিয়া চলিতে ও বাতাসে উড়িতে পারেন। আমি তাহা চাই না, আমাকে তাহা হইতে রক্ষা কর। অপর এক দলকে তুমি পৃথিবীর ধন-রত্ন দান করিয়াছ; অপর এক দলকে এমন কারামত দান করিয়াছ যে তাঁহারা এক রজনীতে বহু

দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন। তাঁহারা এরূপ কারামতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমি এই সকল চাই না। উহা হইতে আমাকে রক্ষা কর।' তৎপর পশ্চাতে দৃকপাত করত আমাকে দেখিয়া বলিলেন–'হে ইয়াহ্ইয়া, তুমি এখানে! আমি বলিলাম–'হাঁ, হুযূর।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন–'কতক্ষণ যাবত আছ? আমি বলিলাম-'অনেকক্ষণ যাবত।" আমি নিবেদন করিলাম–'আমাকে এই অবস্থা বুঝাইয়া দিন।" তিনি বলিলেন–"যাহা তোমাকে জানাইবার যোগ্য তাহা বলিতেছি–আল্লাহ আমাকে তাঁহার রাজ্যের উচ্চ ও নিচ সমস্ত প্রদেশ দেখাইলেন; আরশ, কুরসী, আকাশ এবং বেহেশত দেখাইয়া বলিলেন–'এই সমস্তের মধ্যে কি চাও বল; যাহা চাও তাহাই দিব।' আমি নিবেদন করিলাম–'এই সকলের আমি কিছুই চাহি না।' আল্লাহ বলিলেন–'সত্যই তুমি আমার বান্দা।'

হযরত আবূ তোরাব বখ্শীর (র) এক বড় মুরীদ ছিলেন, তিনি সর্বদা নিজ কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। হযরত আবূ তোরাব (র) একদা বলিলেন–"তুমি একবার হযরত বায়েযীদের সহিত দেখা করিলে ভাল হইত।" মুরীদ বলিলেন–"তাহার সহিত দেখা করার কোন আবশ্যকতা আমার নাই।" হযরত আবূ তোরাব (র) আরও কয়েকবার মুরীদকে ঐ কথাই বলিলেন। মুরীদ উত্তর দিলেন–"আমি বায়েযীদের খোদাকে দেখিয়া থাকি; বায়েযীদকে দেখিয়া কি করিব?" হযরত আবূ তোরাব (র) বলিলেন–"তোমার জন্য বায়েযীদকে একবার দর্শন করা খোদাকে সত্তর বার দর্শন অপেক্ষা উত্তম।" মুরীদ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"ইহার অর্থ কি? হযরত আবূ তোরাব (র) বলিলেন–"হে নির্বোধ, তুমি তোমার মর্যাদা অনুযায়ী খোদাকে দেখিতেছ; তিনিও তদনুযায়ী তোমার নিকট প্রকাশ পাইতেছেন এবং হযরত বায়েযীদকে (র) খোদার নিকট তাঁহার মর্যাদা অনুযায়ী দেখিতে পাইবে।" এই সূক্ষ্ম কথা বুঝিয়া মুরীদ নিবেদন করিলেন–"চলুন, আমরা উভয়ে যাই।" হযরত আবূ তোরাব (র) বলেন–"আমরা উভয়ে হযরত বায়েযীদের (র) নিকট গেলাম। তিনি এক জঙ্গলে বসিয়া ছিলেন। আমরা তাঁহার নিকটবর্তী হইলে উলটা পোস্তীন পরিহিত অবস্থায় তিনি বাহিরে আসিলেন। মুরীদ তাঁহাকে দেখিবামাত্র এক চিৎকার দিল এবং তৎক্ষণাৎ মরিয়া গেল। আমি বলিলাম–'হে বায়েযীদ, আপনাকে একনযর দেখিলেই কি তাহাকে হত্যা করা উচিত?' তিনি বলিলেন–'না, তাহা নহে। তিনি সত্যপরায়ণ মুরীদ ছিলেন। তাঁহার মধ্যে এক

গোপন রহস্য ছিল। নিজ ক্ষমতায় তিনি সেই রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। আমাকে দেখামাত্র তাঁহার সেই রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িল। তিনি দুর্বল ছিলেন বলিয়া ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া গেলেন।"

হযরত বায়েযীদ (র) বলেন–"আল্লাহ যদি তোমাকে হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালামের ন্যায় বন্ধুত্ব, হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের ন্যায় মুনাজাতের শক্তি এবং হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের ন্যায় রূহানী ক্ষমতা দান করেন তবুও তাঁহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিও না;' কারণ, তাঁহার নিকট হইতে আরও বহু কিছু পাইবার আছে।" হযরত বায়েযীদের (র) এক বন্ধু 'মুযাক্কী' বলেন–'আমি ত্রিশ বৎসর যাবত সারারাত্রি জাগিয়া নামায পড়ি এবং দিনে রোযা রাখি। কিন্তু যে-সকল অবস্থার কথা আপনার মুখে শোনা যায় উহার কোনটিই আমার ভাগ্যে প্রকাশ পায় নাই।" হযরত বায়েযীদ (র) বলিলেন–"ত্রিশ শত বৎসর ইবাদত করিলেও তাহা প্রকাশ পাইবে না।" বন্ধু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন–"ইহার কারণ এই যে, তুমি তোমার অহমিকার আবরণে আচ্ছাদিত রহিয়াছ।" তিনি নিবেদন করিলেন–"ইহা হইতে অব্যাহতির উপায় কি?" হযরত বায়েযীদ (র) বলিলেন–"ইহার উপায় তুমি অবলম্বন করিতে পারিবে না।" বন্ধু বলিলেন–"বলুন, আমি তাহা অবলম্বন করিব।" হযরত (র) আবার বলিলেন–"না তুমি তাহা করিবে না।" বন্ধু বার বার অনুরোধ করিতে থাকিলে হযরত বায়েযীদ (র) বলিলেন–"নাপিতের নিকট গিয়া এখনই দাড়ি মুণ্ডাইয়া ফেল এবং একখানি তহ্বন্দ পরিধানপূর্বক সমস্ত দেহ ও মস্তক অনাবৃত রাখ। তৎপর এক থলিয়াপূর্ণ আখরোট গলায় লটকাইয়া বাজারে যাইয়া ঘোষণা কর—যে-বালক আমার ঘাড়ে বেত্রাঘাত করিবে তাহাকে একটি আখরোট দিব। এই অবস্থায়ই কাযী ও শরীয়তের পাবন্দ লোকদের নিকট গমন কর।" সেই ব্যক্তি বলিলেন–"সুবহানাল্লাহ্, আপনি কেমন ব্যবস্থা দিলেন!" হযরত বায়েযীদ (র) বলিলেন–"তুমি যেভাবে সুবহানাল্লাহ্ বলিলে তাহাতে শিরক করিলে। কারণ, তুমি স্বীয় সম্মানের জন্যই এরূপ বলিয়াছ।" মুযাক্কী বলিলেন–"অন্য কোন ব্যবস্থা দিন। ইহা আমি পারিব না।" হযরত বায়েযীদ (র) বলিলেন–"আমি ত নিজেই যাহা বলিলাম ইহাই প্রথম ব্যবস্থা।" সেই ব্যক্তি বলিলেন–"আমি গ্রহণ করিতে পারিব না।" হযরত বায়েযীদ (র) বলিলেন–"এইজন্যই ত বলিয়াছিলাম যে, তুমি সেই উপায় অবলম্বন করিতে পারিবে না।" হযরত বায়েযীদ (র) স্বীয় বন্ধুর জন্য তদ্রূপ ব্যবস্থা এইজন্য

দিয়াছিলেন যে, তিনি সম্মান-প্রত্যাশী ও অহংকারী ছিলেন এবং এই রোগের এবংবিধ ঔষধই একমাত্র ব্যবস্থা।

হাদীস শরীফে আছে, হযরত ঈসা আলায়হিস সালামের উপর ওহী নাযিল হইল–"হে ঈসা, আমি আমার বান্দাগণের হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যখন দেখি যে, উহাতে দুনিয়া ও আখিরাতের কিছুই নাই তখন আমার মহব্বত তথায় স্থাপন করিয়া ইহা রক্ষা করিয়া থাকি। হযরত ইবরাহীম আদ্‌হাম (র) মুনাজাতে বলিতেন–"হে আল্লাহ।, তুমি যে মহব্বত আমাকে দান করিয়াছ এবং তোমার যিকিরের প্রতি আসক্তি আমাকে দিয়াছ, তুমি জান, উহার তুলনায় বেহেশত আমার নিকট মশক-পালকের সমানও নহে।" হযরত রাবেয়াকে (র) লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কিরূপ ভালবাসেন?" তিনি বলিলেন–"ইহা নিতান্ত কঠিন। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার মহব্বত আমাকে সৃষ্ট পদার্থের মহব্বত হইতে বিরত রাখিয়াছে।" হযরত ঈসা আলায়হিস সালামকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"কোন্ কার্য সকল কার্য অপেক্ষা উত্তম?" তিনি বলিলেন–"আল্লাহ্‌র মহব্বত এবং তাঁহার প্রত্যেক কার্যে সন্তুষ্ট থাকা।"

মোটকথা, এই মর্মে বহু হাদীস ও বুযুর্গগণের উক্তি আছে। এই সকল বুযুর্গের অবস্থা দৃষ্টে স্বভাবতই বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র মা'রিফাত ও তাঁহার মহব্বতের আনন্দ বেহেশ্‌তের আনন্দ অপেক্ষা বহুগুণে বেশী। প্রিয় পাঠক, এ-দিকে তোমার গভীর মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

আল্লাহ্‌র মা'রিফাত গুপ্ত থাকার কারণ–কোন জিনিসের অবস্থা জানা কঠিন হইলে সেই কাঠিন্য দুই কারণে ঘটিয়া থাকে। প্রথম-ইহা গুপ্ত থাকে, প্রকাশ পায় না। দ্বিতীয়–ইহা এত উজ্জ্বল যে, চক্ষু ইহার তেজ সহ্য করিতে পারে না। এজন্যই চামচিকা রাত্রিকালেই দেখিতে পায়, দিবসে দেখিতে পায় না। ইহার কারণ এই নহে যে, রাত্রিকালে জিনিস প্রকাশ পায়; এবং দিবসেই সমস্ত জিনিস নিতান্ত প্রকাশিত হইয়া থাকে। তবে চামচিকার দর্শনশক্তি নিতান্ত দুর্বল বলিয়া সূর্যের প্রখর আলোক ইহার চক্ষে সহ্য হয় না। তদ্রূপ আল্লাহ্‌র নূর অতীব উজ্জ্বল এবং মানব-হৃদয়ে ইহার পরিচয় লাভের ক্ষমতা নাই বলিয়াই আল্লাহ্‌র মা'রিফাত এত কঠিন।

একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ্‌র নূর ও তাঁহার প্রকাশ বোধগম্য হইবে। একখানা লিখিত পত্র বা সেলাই করা একটি বস্ত্র দেখিয়া তুমি লেখক এবং

দর্জির শক্তি, জ্ঞান, অস্তিত্ব ও ইচ্ছা সম্বন্ধে সুন্দররূপে অবগত হইতে পার। কারণ, পত্র ও বস্ত্র তাহাদের ঐ গুণসমূহ এমনভাবে প্রকাশ করিতেছে যে, তৎসম্বন্ধে তোমার ধ্রুব জ্ঞান জন্মে। আল্লাহ যদি সমস্ত বিশ্বে একটি পক্ষী বা একটি উদ্ভিদমাত্র সৃজন করিতেন তবে তাহা দেখিয়া সকলেই সৃষ্টিকর্তার পূর্ণ জ্ঞান, শক্তি, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের পরিচয় অবশ্যই লাভ করিত। কারণ, পত্র দ্বারা পত্রলেখকের অস্তিত্ব যেরূপ বুঝা যায়, শিল্পকার্য দর্শনে শিল্পীর অস্তিত্ব তদপেক্ষা স্পষ্টভাবে বোধগম্য হইয়া থাকে। কিন্তু আসমান-যমীন, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, পাথর, মৃত্তিকাখণ্ড যত কিছু মানুষের চিন্তায় আসে, এই সমস্তই একবাক্যে এক মহান সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিতেছে। আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভের এই সমস্ত অসংখ্য প্রমাণ ও তাঁহার নূরের অতীব প্রখর দীপ্তির কারণেই তাঁহার মা'রিফাত নিতান্ত গুপ্ত। কারণ, একটি দ্রব্য যদি আল্লাহ্‌র তৈয়ারী হইত এবং অপরটি অন্য কাহারও তৈয়ারী হইত তবেই মা'রিফাত প্রকাশ হইত। সকল শিল্পই এক নিয়মের অধীন হওয়ার কারণে শিল্পীকে বুঝা যাইতেছে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ, কোন বস্তুই সূর্যের আলোক অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল নহে। কারণ, সূর্যের আলোকেই সবকিছু দৃষ্টগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু সূর্য যদি অস্ত না যাইত বা মেঘাবৃত না হইত তবে জগতে যে সূর্যের আলোকই একমাত্র আলোক তাহা কেহই বুঝিত না। সূর্য সর্বদা উদিত থাকিলে সাদা, কাল ও অন্যান্য বর্ণ চিরকাল একই প্রকারে দেখিতে পাওয়া যাইত। সুতরাং বর্ণ ব্যতীত আলোক বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ কেহ বুঝিতে পারিত না। কিন্তু সূর্য অস্তমিত হওয়ার দরুন ভূপৃষ্ঠ অন্ধকার হইয়া গেলে সাদা, কাল ইত্যাদি সমস্ত বর্ণই অদৃশ্য হইয়া যায়; সূর্যের আলোকের ফলেই সমস্ত বর্ণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে বুঝা যায় যে, শুভ্র-কৃষ্ণাদি বর্ণ ব্যতীত আলোক নামে অপর এক পদার্থ আছে। কাজেই সূর্যের বিপরীত পদার্থ অর্থাৎ অন্ধকার দ্বারা সূর্যের পরিচয় পাওয়া গেল। এইরূপ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ যদি কখন অদৃশ্য হইতেন বা না থাকিতেন এবং তজ্জন্য আসমান-যমীন বিশৃঙ্খল ও ধ্বংস হইয়া যাইত তবে তাঁহাকে লোকে আপনা-আপনিই চিনিতে পারিত। কিন্তু সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রবল ও পরিষ্কার সাক্ষ্য দিতেছে এবং সমস্ত সৃষ্ট পদার্থই একই নিয়মের অধীন। অতএব প্রমাণের বাহুল্যও চির ঔজ্জ্বল্যের কারণেই আল্লাহ্‌র মা'রিফাত (পরিচয়) গুপ্ত রহিয়াছে।

আল্লাহর পরিচয় গোপন থাকার অপর এক কারণ এই যে শৈশবকাল হইতেই আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর শিল্প ও সৃষ্ট পদার্থ দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। তখন

বুদ্ধি বিকশিত হয় না বলিয়া আল্লাহ্‌র সৃষ্ট পদার্থের পরিষ্কার সাক্ষ্য বুঝিতে পারা যায় না। বিস্ময়কর পদার্থ সর্বদা চক্ষের উপর দেখিতে দেখিতে অভ্যাসক্রমে উহার সহিত সখ্যতা জন্মে। তৎপর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিচার-ক্ষমতা জন্মিলে পূর্বপরিচিত পদার্থগুলি আল্লাহ্‌র অসীম শিল্পনৈপুণ্যের উজ্জ্বল সাক্ষ্য দিতে থাকিলেও মানবমন সেই সাক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিতে পারে না। কিন্তু কোন অপরিচিত দুষ্প্রাপ্য জীব বা বিস্ময়কর উদ্ভিদ দৃষ্টিগোচর হইলে লোকের মুখ হইতে বিস্ময় প্রকাশক 'সুবহানাল্লাহ' কলেমা আপনা-আপনিই বাহির হয়। কারণ, সেই অপরিচিত বস্তু সৃষ্টিকর্তার যে-সাক্ষ্য দেয়, অনভ্যস্ত হওয়ার দরুন মন তাহা সহজেই গ্রহণ করে।

মূলকথা, যাহার দর্শন ক্ষমতা দুর্বল নহে সে যে-পদার্থই দর্শন করুক না কেন, ইহাতে সৃষ্টিকর্তাকেই দেখিয়া থাকে, সৃষ্টি পদার্থকে দেখে না। কারণ, আল্লাহ্‌র শিল্পনৈপুণ্যের নির্দশন হিসাবেই সে আকাশ ও পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি লেখাপড়া জানে না সে কোন চিঠি দেখিলে কাগজ ও কালির দাগই দেখিয়া থাকে। কিন্তু কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি চিঠি দেখিলে উহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য এমনকি চিঠির লেখককেই দেখিয়া থাকে। কারণ রচনার মাধ্যমে রচয়িতাই মানবের নিকট প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। রচনা করিতে যাইয়া রচয়িতা কাগজের উপর যে দাগ কাটে তৎপ্রতি লোকে মোটেই লক্ষ্য করে না। যাঁহার এইরূপ উন্নত শ্রেণীর দর্শন ক্ষমতা আছে তিনি যাহাই দেখেন না কেন, তাহাতে আল্লাহকেই দেখিয়া থাকেন। কারণ, এমন কোন পদার্থ নাই যাহা তাঁহার সৃষ্ট নহে; বরং সমস্ত বিশ্ব একমাত্র তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রিয় পাঠক, তুমি সমস্ত বিশ্ব চরাচরে আল্লাহ্‌ ও তাঁহার সৃষ্ট পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ আল্লাহ্‌র অসীম শক্তি, অনন্ত মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। জগতে ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বল আর কিছুই নাই। কিন্তু মানব স্বীয় দুর্বলতার জন্য আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভে বঞ্চিত রহিয়াছে।

মহব্বত পয়দা করিবার উপায়

মহব্বত অতি শ্রেষ্ঠ মকাম। এই মকামে উপনীত হওয়ার উপায় জানা নিতান্ত আবশ্যক। কেহ কাহারও প্রতি আসক্ত হইতে চাহিলে সর্বদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কেবল তাহার দিকে চাহিয়া থাকা আবশ্যক। বদনমণ্ডল দৃষ্টিগোচর

হওয়ার পর হস্ত-পদের সৌন্দর্য যদি গোপন থাকে তবে উহাও দেখিবার চেষ্টা করা উচিত। কারণ, সৌন্দর্য যতই দেখা যায় অনুরাগ ততই বৃদ্ধি পায়। সর্বদা দর্শনে ব্যাপৃত থাকিলে দর্শকের মনে আপনা-আপনিই অনুরাগ জন্মিবে। আল্লাহ্‌র সহিত মহব্বত স্থাপনের নিয়মও ইহাই। আল্লাহ্‌র সহিত মহব্বত স্থাপনের প্রথম শর্ত এই যে, মানুষকে দুনিয়ার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে এবং এই জঘন্য দুনিয়ার মহব্বত হইতে হৃদয় পাক করিতে হইবে। কারণ, দুনিয়ার মহব্বত মানুষকে আল্লাহ্‌র মহব্বত হইতে বঞ্চিত রাখে। হৃদয় পাক করা, বীজ বপনের জন্য ক্ষেত্র হইতে আগাছা পরিষ্কার করা তুল্য। তৎপর আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করিতে হইবে; কেননা যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভালবাসে না সে তাঁহার পরিচয় পায় নাই বলিয়াই ভালবাসে না। কারণ, সৌন্দর্য ও চরম উৎকর্ষ স্বভাবতই মানবের প্রিয়। এমনকি, যে-ব্যক্তি হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ভালরূপে চিনিতে পারিয়াছে সে তাঁহাদিগকে ভাল-না-বাসিয়া পারে না; কেননা সদ্‌গুণাবলী স্বভাবতই লোকে ভালবাসে।

আল্লাহ্‌র মা'রিফাত হাসিল করার ক্ষেত্রে হৃদয় পাক করা বীজবপন তুল্য এবং তৎপর যিকির-ফিকিরে মশগুল হওয়া সেই ক্ষেত্রে পানি সেচন সদৃশ। কারণ, কাহাকেও অতিরিক্ত স্মরণ করিতে থাকিলে স্মরণকারীর হৃদয়ে আপনা-আপনিই ভালবাসা জন্মিয়া থাকে।

আল্লাহ্‌র মহব্বতে তারতম্য হওয়ার কারণ–কোন মুসলমানই আল্লাহ্‌র মহব্বত শূন্য হইতে পারে না। তবে তিন কারণে এই মহব্বতে তারতম্য হইয়া থাকে। এক বস্তুর মহব্বত অপর বস্তুর মহব্বত কমাইয়া দেয়। দুনিয়া ও দুনিয়া অর্জনে কাহারও আকর্ষণ অধিক, কাহারও কম। সুতরাং এই তারতম্যের জন্যই আল্লাহ্‌র মহব্বতে তারতম্য ঘটিয়া থাকে। **প্রথম কারণ**–দুনিয়ার প্রতি মহব্বত ও দুনিয়া অর্জনে লিপ্ততা বিষয়ে মানুষে মানুষে পার্থক্য; কেননা, এক বস্তুর মহব্বত অপর বস্তুর মহব্বত কমাইয়া দেয়। **দ্বিতীয় কারণ–আল্লাহ্‌র** মারিফাত হাসিলে মানুষে মানুষে প্রভেদ। সাধারণ লোক হযরত ইমাম শাফিঈকে (র) একজন বড় আলিম বলিয়া ভালবাসিয়া থাকে। একজন ফকীহ্‌ ফিকাহ্‌ শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাঁহাকে তদপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়া থাকেন। সাধারণ লোক তাঁহার সম্বন্ধে যে পরিমাণে পরিচয় পাইতে পারে, আলিম লোক তদপেক্ষা অধিক পরিচয় পাইয়া থাকেন। আবার, হযরত ইমাম

সাহেবের (র) মযনী নামক এক শাগরেদ ছিলেন। তিনি ইমাম (র) সাহেবের অধ্যাত্মিক অবস্থা, অসাধারণ জ্ঞান ও উন্নত স্বভাবের পরিচয় পাইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি হযরত ইমাম সাহেবকে (র) সকল ফকীহ অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। এইরূপ যে-ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যত পরিচয় পাইয়াছেন তিনি তাঁহাকে তত ভালবাসিয়া থাকেন। **তৃতীয় কারণ**–যিকির ও ইবাদত দ্বারা আল্লাহ্‌র সহিত মহব্বত হয়। কিন্তু সব লোকে সমান যিকির ও ইবাদত করে না। সুতরাং যিকির ও ইবাদতে হ্রাস-বৃদ্ধির দরুন মহব্বতে তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

কেহ আল্লাহ্‌কে একেবারেই ভাল না বাসিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সে আল্লাহ্‌কে কখনও চিনিতে পারে নাই। কারণ, লোকে যেরূপ বাহ্য সৌন্দর্য ভালবাসে, স্বভাবের অন্তর্গত সৌন্দর্যও তদ্রূপ ভালবাসে। সুতরাং পরিচয় হইতেই ভালবাসা জন্মে।

মা'রিফাত লাভের পন্থা– পূর্ণ মা'রিফাত লাভের দুইটি পন্থা আছে। **প্রথম পন্থা**–সূফীগণের অবলম্বিত পথে মুজাহাদা (সাধনা) ও সর্বদা যিকির দ্বারা হৃদয় পরিষ্কার করিয়া লওয়া। উহার ফলে সাধক নিজের ও আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব ভুলিয়া যায়। অবশেষে এমন অবস্থা হয় যে তখন আল্লাহ্‌র প্রতাপ চাক্ষুষ দর্শনের ন্যায় উজ্জ্বলভাবে তাহার অন্তরে উদ্ভাসিত হইতে থাকে। এই পন্থাকে শিকারীদের ফাঁদ পাতার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই ফাঁদে শিকার ধরা পড়িতে পারে, আবার ধরা না-ও পড়িতে পারে; অথবা উহাতে ইঁদুর ধরা পড়িতে পারে, আবার বাজও আটকাইতে পারে। এই পন্থায় কাহার কি লাভ হইবে তৎসম্বন্ধে প্রত্যেক সাধকের অদৃষ্ট-অনুসারে বড় প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। **দ্বিতীয় পন্থা**–ইলমে মা'রিফাত শিক্ষা করা তর্কশাস্ত্র ও অন্যান্য ইলম শিক্ষা করা নহে। আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর সৃষ্টিকৌশল লইয়া চিন্তা করা ইলমে মা'রিফাতের আরম্ভ। এই বিষয়ে এই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। সৃষ্ট পদার্থ লইয়া চিন্তা করিতে করিতে উন্নতি করত আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য ও প্রতাপ লইয়া চিন্তা করিতে হইবে। তাহাতে আল্লাহ্‌র নাম ও গুণের মর্ম পরিষ্কাররূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। ইহা অতি শ্রেষ্ঠ ইলম। বুদ্ধিমান মুরীদ কামিল পীরের সাহায্যে এই ইলম শিক্ষা করিতে পারে। নির্বোধ ব্যক্তি এই ইলম শিক্ষা করিতে পারে না। এই পন্থা ফাঁদ পাতার ন্যায় নহে যে, ইহাতে শিকার পড়িবে, কি না-পড়িবে এই সন্দেহ হইবে; বরং এই পন্থা কৃষি-বাণিজ্যের ন্যায়। ছাগ-ছাগীর

মিলনে যেমন ছাগলের বংশ বৃদ্ধি হয় এবং সম্পদ বৃদ্ধি পায়, এই পন্থাও ঠিক তদ্রূপ। কিন্তু বজ্রপাত হইয়া ছাগীর মৃত্যু ঘটিলে অবশ্য ইহার উপর কাহারও হাত নাই।

মা'রিফাতের পন্থা ত্যাগ করিয়া কেহ আল্লাহ্‌র মহব্বত পাইতে চাহিলে দুরাকাঙ্ক্ষা করা হইবে। আবার মা'রিফাত লাভের যে দুই পথের সন্ধান উপরে দেওয়া হইল উহা পরিত্যাগ করত অন্য কোন পথ অবলম্বন করিলে অকৃতকার্য হইতে হইবে।

পরকালের সৌভাগ্য–যে-ব্যক্তি মনে করে, আল্লাহ্‌র মহব্বত ব্যতীত পরকালের সৌভাগ্য লাভ করিবে সে নিতান্ত ভুলে পড়িয়া রহিয়াছে। কারণ, পরকারের অর্থই হইল আল্লাহ্‌র নিকটে উপস্থিত হওয়া। মনে কর, একজন অপরজনকে ভালবাসে এবং তাহার সঙ্গে মিলনের জন্য মনে প্রবল অনুরাগ আছে। কিন্তু কোন প্রবল অন্তরায়ের জন্য মিলিত হইতে পারিতেছে না; বহুদিন সেই অনুরাগ হৃদয়ে লইয়া কালাতিপাত করিতেছে। এমন সময় হঠাৎ সেই বাধা ঘুচিয়া গেল এবং প্রিয়জনের সহিত মিলন ঘটিল। এমতাবস্থায় তাহার আনন্দের পরিসীমা থাকিবে না। পূর্ব হইতেই আল্লাহ্‌র প্রতি তদ্রূপ অনুরাগ রাখিয়া পরকালে তাঁহার সহিত মিলিত হওয়াকে সৌভাগ্য বলে। প্রথমাবধি প্রিয় বস্তুর প্রতি ভালবাসা না থাকিলে তাহার সঙ্গে মিলনে কিছুমাত্র আনন্দ পাওয়া যায় না। অল্প ভালবাসা থাকিলে অল্প আনন্দ পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায়, ইশ্‌ক ও মহব্বতের অনুপাতে সৌভাগ্য লাভ হয়।

অপরপক্ষে, প্রিয়জনের শত্রুর সহিত বন্ধুত্ব ও সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গেলে পরকালে তাহার অবস্থা ঐ ব্যক্তির বিপরীত হইবে (অর্থাৎ তাহার আনন্দের লেশমাত্রও থাকিবে না।) এবং এই কারণেই সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে ও দুঃখকষ্টে নিপতিত হইবে। যে-বস্তু লাভে অপর লোক পরম সৌভাগ্যশালী হইবে ইহার কারণেই সে পরম দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হইবে। ইহা বুঝাইবার জন্য উপমাস্বরূপ একটি গল্প বলা যাইতেছে। এক মেথর আতর প্রস্তুতের কারখানার গেল। সে সেই স্থানের সুগন্ধ আঘ্রাণে বেহুশ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। লোকে তাহার মাথায় গোলাপজল দিতে লাগিল এবং মৃগনাভি তাহার নাকে ধরিল। কিন্তু ইহাতে তাহার অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইতে লাগিল। এমন সময় এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল; সে পূর্বে কিছুকাল মেথরের কাজ করিয়াছিল। সে তাহার অবস্থা বুঝিল এবং মানুষের মল আনয়ন করত ভিজাইয়া তাহার নাকে

মালিশ করিয়া দিল। সেই মেথরের তৎক্ষণাৎ হুশ হইল এবং সে বলিতে লাগিল–"এই ত সুগন্ধ।" এইরূপ যাহারা দুনিয়া উপভোগে আনন্দ পায় এবং দুনিয়া যাহাদের নিকট অতি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে তাহারা উক্ত মেথর সৃদশ।

উক্ত মেথর যেমন আতরের কারখানায় তাহার আকাঙ্ক্ষিত মল পায় নাই, বরং তথায় যে-সকল সুগন্ধিদ্রব্য ছিল উহা তাহার স্বভাবের বিরোধী ছিল বলিয়া তাহার দুঃখ-কষ্ট অধিক হইতেছিল, তদ্রূপ পরকালেও সংসারাসক্ত লোকে দুনিয়ার নিকৃষ্ট পদার্থের কিছুই পাইবে না এবং তথায় যে সকল নি'আমত থাকিবে উহা তাহার স্বভাবের বিরোধী হইবে বলিয়া ঐ সকল নি'আমতই তাহার দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভাগ্যের কারণ হইবে। পরকালে কেবল আত্মা ও আল্লাহ্‌র সৌন্দর্যের রাজ্য। আল্লাহ্‌র অসীম সৌন্দর্য সেখানে প্রকাশ পাইবে। পরকালে যাইবার পূর্বেই এই পৃথিবী হইতে যে-ব্যক্তি স্বীয় স্বভাবকে তথাকার উপযুক্ত ও অনুযায়ী করিয়া লইতে পারে সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যশালী। সকল রিয়াযত, ইবাদত ও মা'রিফাতের উদ্দেশ্যই হইল স্বভাবকে পরকালের উপযুক্ত করিয়া তোলা। পরকালের প্রতি আসক্তি জন্মিলেই বুঝা যায় যে, মানব-প্রকৃতি পরকালের উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। এই অর্থেই আল্লাহ্‌র বলেন ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا – অর্থাৎ "যে-ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে পবিত্র করিয়াছে সে নিশ্চয়ই সৌভাগ্যশালী হইয়াছে।" অপর দিকে দুনিয়ার যাবতীয় পাপ, কুপ্রবৃত্তি ও দুনিয়ার মহব্বতে লিপ্ত থাকিলেই বুঝিতে হইবে যে, স্বভাব পরকারের উপযোগী হয় নাই। এই মর্মে আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا – অর্থাৎ "যে-ব্যক্তি স্বীয় আত্মাকে অপবিত্র করিয়াছে সে সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়াছে।"

আরিফগণ উপরিউক্তি বিষয় এমন সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পান যে, তাঁহাদিগকে উহা মানিয়া লইবার জন্য শুধু বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করার প্রয়োজন হয় না। এই বিষয়ে তাঁহারা নবীগণের ন্যায় ধ্রুবজ্ঞান অর্জন করিয়াছেন। বরং এই ধ্রুবজ্ঞানের ফলে নবীগণের বিশ্বস্ততা মু'জিযা ব্যতীতই তাঁহারা অকাট্যরূপে বিশ্বাস করিয়া লইয়াছেন। কারণ, অভিজ্ঞ চিকিৎসক অপর খাঁটি চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র দেখিয়াই ব্যবস্থা-দাতাকে যথার্থ চিকিৎসক বলিয়া বুঝিতে পারে এবং কোন অনভিজ্ঞ দোকানদার চিকিৎসকের কথা শুনিয়াই তাহাকে মূর্খ বলিয়া বুঝিয়া লয়। তদ্রূপ ধ্রুবজ্ঞান দ্বারা আরিফ লোক কে খাঁটি

নবী আর কে জাল নবী বুঝিতে পারেন। আর আরিফ লোক নিজ দর্শন-ক্ষমতালব্ধ ধ্রুবজ্ঞানে যাহা জানিতে পারেন নবীগণের মুখেও তাহাই শুনিতে পান। এই প্রকার জ্ঞান নিতান্ত সুদৃঢ় হইয়া থাকে। লাঠিকে সর্প হইতে দেখিয়া অর্থাৎ নবীগণের মু'জিযা দর্শনে যে জ্ঞান জন্মে উহা তদ্রূপ নহে। কারণ, মু'জিযালব্ধ জ্ঞান গোবৎসের হাম্বা রবে বিনাশ পাইতে পারে; কেননা যাদু ও মু'জিযার পার্থক্য বুঝা সহজ নহে।

আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বতের নির্দশন– মহব্বত একটি অমূল্য রত্নসদৃশ অনুপম পদার্থ এবং মহব্বতের দাবী করা সহজ নহে। মহব্বতের কতকগুলি নিদর্শন আছে। এইগুলি নিজের মধ্যে আছে কিনা তালাশ না করিয়া নিজকে আল্লাহ-প্রেমিকদের অন্তর্ভুক্ত মনে করা কাহারও উচিত নহে। মহব্বতের সাতটি নির্দশন আছে।

প্রথম নিদর্শন– মৃত্যুর প্রতি অসন্তুষ্ট না থাকা। কারণ, প্রেমিক প্রেমাস্পদকে দেখিবার অভিলাষী না হইয়া থাকিতে পারে না। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দর্শন ভালবাসে আল্লাহ্‌ও তাহাকে দেখিতে ভালবাসেন।" হযরত আবুল আলী (র) এক সংসারবিরাগীকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"তুমি কি মৃত্যুকে ভালবাস?" সেই ব্যক্তি উত্তর দিতে বিলম্ব করিতেছে দেখিয়া তিনি নিজেই বলিলেন–"তুমি অকপট হইলে মৃত্যুকে ভালবাসিবে।" পরকালের পাথেয় অদ্যাবধি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই, অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিলে অধিক পরমাণে সংগ্রহ করিয়া লইতে অবসর পাইবেন, এই উদ্দেশ্যে আসল মৃত্যুকে অপ্রিয় মনে না করিয়া শীঘ্র মরাকে অপছন্দ করা আল্লাহ-প্রেমিকের পক্ষে জায়েয আছে। এই শ্রেণীর লোকের নিদর্শন এই যে, তাঁহারা সর্বদা আখিরাতের সম্বল সংগ্রহে লাগিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় নিদর্শন– আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিজের প্রিয় বস্তু উৎসর্গ করা। আর যে-বস্তু আল্লাহ্‌র সহিত নিজের সান্নিধ্য ঘটাইতে পারে তাহা ত্যাগ না করা এবং যাহা আল্লাহ হইতে দূরবর্তী করিয়া দেয় তাহা হইতে দূরে থাকা। যিনি সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্‌কে ভালবাসেন তাঁহার অবস্থাই এইরূপ হইয়া থাকে; যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে-ব্যক্তি সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্‌কে ভালবাসে তেমন লোক যদি কেহ দেখিতে চায় তবে যেন সে হুযায়ফার মুক্ত গোলাম সালিমকে দেখে।" কাহারও দ্বারা পাপকার্য

ঘটিলেই প্রমাণিত হয় না যে, তাহার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত নাই; বরং সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌কে সর্বান্তঃকরণে ভালবাসে না ইহা তাহারই প্রমাণ। আমাদের এই উক্তির পক্ষে প্রমাণ এই যে, নু'মান নামক এক ব্যক্তিকে শরাব পানের অপরাধে কয়েক বার শাস্তি দেওয়া হইলে এক সাহাবী (র) তাহার উপর লা'নত করিলেন। ইহাতে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন–"লা'নত করিও না, কারণ সে আল্লাহ্ ও রাসূলকে ভালবাসে।" হযরত ফুযায়ল (র) এক ব্যক্তিকে বলিলেন–"লোকে যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেন–'তুমি আল্লাহ্‌কে ভালবাস কি?' তবে চুপ থাক। কারণ, যদি বল–ভালবাসি না, তবে তোমাকে কাফির হইতে হইবে। আর যদি বল–ভালবাসি, তবে তোমার কার্যকলাপ আল্লাহ্‌র বন্ধুগণের কার্যকলাপের তুল্য হইবে না।"

তৃতীয় নিদর্শন– আল্লাহ্‌র যিকির সর্বদা হৃদয়ে সজীব থাকা এবং তাঁহার সহিত মিলনের জন্য অনায়াসে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকা। কারণ, লোকে যাহাকে ভালবাসে তাহাকে অধিক স্মরণ করিয়া থাকে। ভালবাসা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে নিমিষের তরেও প্রিয় পদার্থকে ভুলিতে পারা যায় না। চেষ্টাচরিত্র করিয়া মনকে আল্লাহ্‌র স্মরণে লাগাইতে হইলে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র মহব্বত তাহার হৃদয়ে প্রবল নহে; বরং যে-পদার্থের মহব্বত তাহার হৃদয়ে প্রবল ইহাই তাহার প্রিয়। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র মহব্বত স্থাপন করিতে চায় তবে বলা যাইবে যে, আল্লাহ্‌র মহব্বতের প্রতি আকর্ষণ তাহার হৃদয়ে প্রবল। কারণ, মহব্বত এবং মহব্বতের প্রতি আকর্ষণ এক নহে।

চতুর্থ নির্দশন– কুরআন শরীফকে আল্লাহ্‌র কালাম বলিয়া ভালবাসা এবং রাসূল ও আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্কিত সকল পদার্থকে ভালবাসা। এই ভালবাসা প্রবল হইয়া উঠিলে আল্লাহ্‌র বান্দা বলিয়া সকল বিশ্বাসীর প্রতি এবং তাঁহার সৃষ্ট বলিয়া সকল পদার্থের প্রতি ভালবাসা জন্মে। কারণ, লোকে যাহাকে ভালবাসে তাহার রচনা এবং পত্রও ভাল লাগে।

পঞ্চম নির্দশন–নির্জনতা ও মুনাজাতের প্রতি আসক্তি এবং রজনী আগমনের প্রতীক্ষায় থাকা। কেননা, রজনী আগমনে দিবসে কর্মব্যস্ততা ও সমস্ত বাধাবিঘ্ন ঘুচিয়া যায় এবং তখন নির্জনে বন্ধুর নিকট আত্মনিবেদনের সুযোগ ঘটে। যে-ব্যক্তি সময়ে-অসময়ে নিদ্রা যায়, অনর্থক কথাবার্তায় সময় কাটায় এবং নির্জনবাস অপেক্ষা জনতা ভালবাসে, আল্লাহ্‌র প্রতি তাহার ভালবাসা থাকিলেও ইহা নিতান্ত কাঁচা। হযরত দাউদ আলায়হিস সালামের উপর ওহী

নাযিল হইল–"হে দাউদ, মানুষের সহিত ভালবাসা পাতাইও না। কারণ, দুই প্রকার লোক আমার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত থাকে– (১) যে-ব্যক্তি সওয়াব শীঘ্র পাইতে চায় এবং বিলম্বে পাইলে কার্যে শিথিল হইয়া পড়ে; (২) যে-ব্যক্তি আমাকে ভুলিয়া নিজ খেয়ালে ডুবিয়া থাকে। এইরূপ লোক যে আমার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত ইহার নিদর্শন এই, আমি তদ্রূপ লোককে তাহার অবস্থার উপর ছাড়িয়া দেই এবং দুনিয়াতে তাহাকে ব্যস্ত রাখি।" যাহা হউক, আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মহব্বত হইলে আল্লাহ ব্যতীত সকল পদার্থের মহব্বত একেবারে লোপ পায়।

বানী ইসরাঈল বংশের এক আবিদ রাত্রি জাগরণ করিয়া ইবাদত করিতেন। অনতিদূরে এক বৃক্ষের উপর একটি পক্ষী সুমিষ্ট গান গাহিল শুনিয়া তিনি সেই বৃক্ষের নিচে গিয়া নামাযে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তৎকালীন নবীর (আ) উপর ওহী অবতীর্ণ হইল–"ঐ আবিদকে জানাইয়া দাও, পক্ষীর মিষ্ট স্বর সে ভালবাসিয়াছে বলিয়া তাহার মর্যাদার এক দরজা কমিয়া গেল। তৎপর কোন আমল দ্বারাই সে সেই দরজা লাভ করিবে না।" আল্লাহ্-প্রেমিকগণের কতক লোক এমনও ছিলেন যে, তাঁহারা গৃহের এক কোণে অবস্থানকালে অপর কোণে আগুন লাগিয়া গেলেও তাঁহারা টের পাইতেন না। এক বুযুর্গের এক পায়ে রোগ ছিল। তিনি নামাযে প্রবৃত্ত হইলে পা খানি কাটিয়া ফেলা হইল; অথচ তিনি টেরও পান নাই। হযরত দাউদ আলায়হিস সালামের উপর ওহী নাযিল হইল–"হে দাউদ, যে-ব্যক্তি আমার ভালবাসার দাবী করে, অথচ সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত করে, সে মিথ্যাবাদী। বন্ধু কি বন্ধুর নিদর্শন চায় না? আমাকে যে অন্বেষণ করে আমি তাহার সঙ্গে থাকি।" হযরত মূসা আলায়হিস সালাম নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্ তুমি কোথায় আছ, আমি তোমাকে অন্বেষণ করিতে চাই।" উত্তর হইল–"হে মূসা, তুমি যখন আমাকে অন্বেষণের ইচ্ছা করিয়াছ তখনই আমাকে পাইয়া ফেলিয়াছ।"

ষষ্ঠ নিদর্শন–আল্লাহ-প্রেমিকের নিকট ইবাদত সহজসাধ্য হয়, ভারী বোধ হয় না। এক আবিদ বলেন–"আমি মৃত্যু-যন্ত্রণাতুল্য কষ্ট ভোগ করিয়া ত্রিশ বৎসর তাহাজ্জুদের নামায পড়িয়াছি, ইহার ফলে পরবর্তী ত্রিশ বৎসর সেই নামাযে আনন্দ পাইয়াছি।" আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত পরিপক্ব হইলে ইবাদতে যে-আনন্দ পাওয়া যায় তত আনন্দ আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় ইবাদত কষ্টকর হইবে কিরূপে?

সপ্তম নিদর্শন– আল্লাহ্‌র আজ্ঞাবহ সমস্ত বান্দার প্রতি আল্লাহ-প্রেমিকের ভালবাসা ও দয়া থাকে; কিন্তু কাফির ও পাপীদের প্রতি আল্লাহ্‌র নাফরমান বলিয়া স্বাভাবিক ঘৃণা থাকে; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ –

অর্থাৎ (মুসলমানগণ) কাফিরদের উপর অত্যন্ত কঠিন। (কিন্তু) তাহারা পরস্পর নিতান্ত দয়ালু।" এক নবী (আ) নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ, কোন ব্যক্তি তোমার প্রেমিক?" উত্তর হইল–"শিশু যেমন মাতার জন্য পাগল সেইরূপ যে-ব্যক্তি আমার জন্য পাগল থাকে, পক্ষী যেমন স্বীয় বাসায় আশ্রয় লয় তদ্রূপ যে-ব্যক্তি আমার যিকিরে আশ্রয় লয় এবং ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র যেমন কাহাকেও ভয় করে না তদ্রূপ যে-ব্যক্তি অপরকে কোন পাপ করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হয়, এমন লোকই আমার প্রেমিক।"

আল্লাহ্–প্রেমিকের এই সাতটি এবং এই প্রকার আরও বহু নিদর্শন আছে। যাহার মহব্বত পরিপক্ব হইয়াছে তাঁহার মধ্যে সকল নিদর্শনই পাওয়া যায়। যাহার মধ্যে সকল নির্দশন দেখা যায় না তাহার মহব্বত পরিপক্ব হয় নাই।

অনুরাগ

আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত হইতে পারে না বলিয়া যাহারা অস্বীকার করে তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত মিলিবার এবং তাঁহাকে পাইবার অনুরাগেও অবিশ্বাসী; অথচ রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মুনাজাতে অনুরাগের উল্লেখ আছে। তিনি বলেন ঃ

اَسْئَلُكَ الشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ وَلَذَّةَ النَّظْرِ اِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ –

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, তোমার নিকট তোমার সাক্ষাতের অনুরাগ প্রার্থনা করিতেছি এবং তোমার উদার মুখশ্রী দর্শনের সুখাস্বাদ লাভের প্রার্থনা জানাইতেছি।" হযরত (সা) বলেন যে, আল্লাহ্ বলিয়াছেন–"নেককার লোকের আমাকে দেখিবার যেমন প্রবল অনুরাগ আছে, তাহাদিগকে দেখিবার আমার তদপেক্ষা অধিক অনুরাগ আছে।"

অনুরাগের মর্ম– এখন শওক বা অনুরাগের মর্ম জানা আবশ্যক। লোকে

যাহাকে মোটেই চিনে না তাহার প্রতি মনের টান হওয়া অসম্ভব। আবার জানা-বস্তু সম্মুখে থাকিলে এবং নয়ন ভরিয়া দেখিতে থাকিলেও তৎপ্রতি অনুরাগ থাকে না। যাহাকে জানা গিয়াছে বলিয়া এক হিসাবে প্রেমিকের মানস-চক্ষের সম্মুখে আছে, কিন্তু চাক্ষুষভাবে দেখা যাইতেছে না বলিয়া বর্তমানে নাই, তাহাকে পাওয়ার আশা-উদ্দীপনা মনে স্বতই জাগ্রত থাকে। প্রেমাস্পদের সহিত পূর্ণ মিলনের অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনা লইয়া নিরন্তর তাহার অন্বেষণে থাকাকে অনুরাগ বলে। ইহাতে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্‌র সহিত মিলনের জন্য অনুরক্ত হইলেও দুনিয়াতে তাঁহার মিলন ঘটে না। কারণ, জ্ঞান-চক্ষের সম্মুখে ত তিনি বিরাজমান; কিন্তু চর্মচক্ষে তাঁহাকে দেখা যায় না। পূর্ণ মিলন যেমন এখন পর্যন্ত অপূর্ণ আশামাত্র, পূর্ণ দর্শনও তদ্রূপ জ্ঞানলব্ধ বিষয়মাত্র। মৃত্যু ব্যতীত এই অনুরাগ পরিতৃপ্ত হইতে পারে না।

আবার, এক শ্রেণীর অনুরাগ পরকালেও অতৃপ্ত থাকিবে। কেননা আল্লাহ্‌র পরিচয়-জ্ঞান দুই কারণে এ জগতে অপূর্ণ থাকে। প্রথম, পরিচয়-জ্ঞান সূক্ষ্ম পর্দার অন্তরাল হইতে দর্শনতুল্য অথবা সূর্যোদয়ের পূর্বে ঊষার অন্ধকারে দর্শনের ন্যায় অস্পষ্ট। পরকালে এই পরিচয়-জ্ঞানও নিতান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং অনুরাগও পরিতৃপ্ত হইবে। দ্বিতীয়, এক ব্যক্তি কাহারও প্রতি নিতান্ত আসক্ত। কিন্তু সে প্রেমাস্পদের কেবল মুখমন্ডল দর্শন করিয়াছে, তাহার কেশপাশ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দর্শন করে নাই অথচ সে জানে যে, প্রেমাস্পদের আপাদমস্তক অপার সৌন্দর্যের আধার। এমতাবস্থায় তাহার পূর্ণ দর্শন লাভের একান্ত অনুরাগ প্রেমিকের মনে সর্বদা জাগ্রত থাকে। তদ্রূপ আল্লাহ্‌র চরম সৌন্দর্যের পরিসীমা নাই। এই সৌন্দর্যের যত অধিকই জানা হউক না কেন, যাহা অজ্ঞাত থাকে তাহা নিতান্ত অধিক। কারণ, আল্লাহ্‌র পরিচয়-জ্ঞানের সীমা নাই। আল্লাহ সম্বন্ধে সব কিছু পরিজ্ঞাত না হইলে তাঁহাকে জানাও পরিসমাপ্ত হয় না। এই পরিসমাপ্তি মানবের পক্ষে ইহকালে বা পরকালে কোথায়ও সম্ভবপর নহে; কেননা মানবের জ্ঞান কখনও অপরিসীম হইতে পারে না। সুতরাং পরকালে আল্লাহ্‌র দীদার যত অধিক হইবে আনন্দও তত অধিক বৃদ্ধি পাইবে। এই আনন্দও হইবে নিতান্ত অধিক। যাহা দৃষ্ট হইতেছে তৎপ্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে প্রেমিক আনন্দে একেবারে বিভোর হইয়া যাইবে। ইহাকে বলে উন্‌ছ (প্রীতি)। আর এখন পর্যন্ত যাহা অলক্ষিত রহিয়াছে, তৎপ্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে প্রেমিকের মন তাঁহাকে পূর্ণভাবে পাওয়ার জন্য নিতান্ত

উদগ্রীব হইয়া থাকে। ইহাকেই বলে অনুরাগ। দুনিয়া বা আখিরাতে কোথাও উন্‌ছ ও অনুরাগের শেষ নাই। আল্লাহ্-প্রেমিকগণ আখিরাতেও সর্বদাই বলিতে থাকিবেন ঃ – رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا

অর্থাৎ, "হে আমাদের প্রভু, আমাদের জন্য আমাদের নূর পরিপূর্ণ কর।" এখানে নূর বলার উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌র সৌন্দর্যের যাহা কিছু মানব নয়নে প্রকাশ পায় তাহার সমস্তই নূর, তদ্‌ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। আল্লাহ-প্রেমিকগণ তাঁহার নূর দর্শনের অভিলাষী হইয়া থাকেন; কিন্তু সমস্ত দেখিয়া শেষ করিতে পারেন না। কারণ, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহই আল্লাহ্‌কে পূর্ণভাবে চিনে না এবং তাঁহাকে পূর্ণভাবে চিনিতে পারে না বলিয়াই তাঁহাকে পূর্ণভাবে দেখিতেও পারে না। এইজন্যই অনুরাগবিশিষ্ট লোকের পক্ষে নব নব সৌন্দর্য দর্শনের পথ খুলিতে থাকিবে, তাহাদের ভাগ্যে দীদার বাড়িয়া চলিবে এবং তাহাদের আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। 'বেহেশতে আনন্দের সীমা নাই'–ইহাই এই কথার প্রকৃত অর্থ। তদ্রূপ না হইলে এক রকমের আনন্দ বারবার ভোগ করিতে করিতে সুস্বাদের মাত্রা কমিয়া যাইত। কারণ, একই জিনিস পুনঃ পুনঃ ভোগ করত মন ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে উহাতে আর আনন্দ পাওয়া যায় না। তবে নিত্যনূতন জিনিস মিলিলে আনন্দ পাওয়া যায়। যাহা হউক, বেহেশতবাসিগণ প্রতিপদেই নিত্যনূতন আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিবে। পরবর্তী আনন্দ পূর্বভোগ্য আনন্দ অপেক্ষা সর্বদাই উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর হইয়া চলিবে। কারণ, অনুক্ষণ তাহাদের নি'আমত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

এ-পর্যন্ত অনুরাগ ও উন্‌ছের কথা বর্ণিত হইল। আর বুঝিয়া লও যে, আনন্দদায়ক পদার্থের যাহা সম্মুখে নাই তৎপ্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট না করিয়া যাহা সম্মুখে উপস্থিত পাওয়া গিয়াছে তাহা দর্শনে বা উপভোগে মনের প্রসন্নতাময় পরিতৃপ্ত ভাবের নাম উন্‌ছ। অপর পক্ষে আনন্দদায়ক পদার্থের যাহা এখনও পাওয়া যায় নাই তাহার দিকে মনের যে প্রবল টান থাকে তাহাকে অনুরাগ বলে। সুতরাং ইহপরকালে আল্লাহ্‌র সকল প্রেমিকই উন্‌ছ ও অনুরাগের ডোরেই আবদ্ধ থাকেন।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ হযরত দাউদ আলায়হিস সালামকে সম্বোধন করিয়া বলেন–"হে দাউদ, জগতবাসীকে আমার পক্ষ হইতে জানাইয়া দাও–যে-ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে আমি তাহাকে ভালবাসি। যে-ব্যক্তি নির্জনে আমার সহিত

উপবেশন করে আমি তাহার সঙ্গী। যে-ব্যক্তি আমার স্মরণে প্রীতি লাভ করে আমি তাহার প্রিয়। যে-ব্যক্তি আমার সাথী, আমি তাহার সঙ্গী। যে-ব্যক্তি অপরের মধ্য হইতে আমাকে বাছিয়া লয় আমি তাহাকে বাছিয়া লইয়া শ্রেষ্ঠত্ব দান করি। যে-ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করে আমি তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। যে-ব্যক্তি আমাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসে আমি তাহাকে অবশ্যই অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করি। যে-ব্যক্তি আমাকে অন্বেষণ করে সে অবশ্যই আমাকে পায় এবং যে অপরকে অন্বেষণ করে সে আমাকে পায় না। হে দুনিয়াবাসী, যে-কার্য লইয়া তোমরা মুগ্ধ হইয়াছ তাহার অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া দেখ। আমার সঙ্গ লাভ করিতে, আমার সহিত নির্জনে উপবেশ করিতে এবং আমার সহিত প্রীতি স্থাপন করিতে মনোযোগী হও–আমিও তোমার সহিত প্রীতি স্থাপন করিব। আমার প্রিয় বন্ধু ইবরাহীম (আ) আমার অভিপ্রায়ের মর্মজ্ঞ মূসা (আ) ও আমার নির্বাচিত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রকৃতি ও স্বভাব দিয়া আমি আমার প্রিয় বন্ধুগণের প্রকৃতি ও স্বভাব গঠন করিয়াছি। আমার প্রতি অনুরাগী লোকদের হৃদয় আমার নূর দ্বারা গঠন করিয়াছি এবং স্বীয় প্রতাপ প্রয়োগে উহা বর্ধন করিয়া থাকি।"

অপর এক নবীর (আ) প্রতি ওহী অবতীর্ণ হইল–"আমার বান্দাগণের মধ্যে যে আমাকে ভালবাসে, আমি তাহাকে ভালবাসি। যে-ব্যক্তি আমার আশাধারী, আমি তাহার প্রত্যাশী। যে আমাকে স্মরণ করে, আমি তাহাকে স্মরণ করি। যাহার দৃষ্টি আমার উপর থাকে, আমার দৃষ্টিও তাহার উপর থাকে। তুমি যদি তাহাদের পথ অবলম্বন কর তোমাকেও আমি ভালবাসিব; কিন্তু যদি তাহাদের পথ পরিত্যাগ কর তবে তোমাকে শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিব।"

মহব্বত, অনুরাগ (শওক) উন্‌ছ সম্বন্ধে এবংবিধ বহু হাদীস বর্ণিত আছে। এ-স্থলে যে-সকল হাদীস উদ্ধৃত হইল উহাই যথেষ্ট মনে করি।

সন্তোষ (রেযা)

আল্লাহ্‌র বিধানে সন্তুষ্ট থাকা একটি অতি উচ্চ মকাম। ইহা অপেক্ষা উচ্চ মকাম আর নাই। কারণ মহব্বত একটি অতি শ্রেষ্ঠ মকাম এবং আল্লাহ্ যাহা করেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা মহব্বতের ফল। কিন্তু যেমন—তেমন মহব্বত এই উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করে না, বরং ইহা আল্লাহ্‌র প্রতি একমাত্র চরম মহব্বতেরই

ফল। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"আল্লাহ্‌র বিধানে সন্তুষ্ট থাকা আল্লাহর এক অতি বড় দরগাহ।" একবার তিনি এক কওমের লোককে তাহাদের ঈমানের নির্দশন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা নিবেদন করিল–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা), আমরা বিপদে সবর করি, সম্পদে শোকর করি এবং আল্লাহ্‌র বিধানে সন্তুষ্ট থাকি।" তখন তিনি বলিলেন–"এই কওমের লোক পরিপক্ব জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ আলিম। পূর্ণ জ্ঞানের কারণে তাহাদের মর্যাদা নবীগণের মর্যাদার নিকটবর্তী।" তিনি অন্যত্র বলেন–"কিয়ামত দিবস আমার উম্মতের কতক লোককে আল্লাহ্ তা'আলা পক্ষীয় ন্যায় ডানা প্রদান করিবেন। তাহারা উড়িয়া বেহেশতে চলিয়া যাইবে। ফিরিশতাগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে–'তোমাদের পাপপুণ্যের হিসাব হইয়াছে কি? দাঁড়ীপাল্লাতে তোমাদে পাপপুণ্যের ওযন হইয়াছে কি?' এবং তোমরা পুলসিরাতের উপর দিয়া পার হইয়া আসিয়াছ কি?' তাহারা বলিবে–'আমরা ত এই সমস্তের কিছুই দেখিও নাই।" ফিরিশতাগণ জিজ্ঞাসা করিবে' তোমরা কী?' তাহারা বলিবে–'আমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লামের উম্মত।' ফিরিশতাগণ জিজ্ঞাসা করিবে– "তোমার কি কাজ করিয়াছ যে, এমন শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলে?' তাহারা বলিবে–'আমাদের দুইটি অভ্যাস ছিল–(১) আল্লাহ্‌কে লজ্জা করিয়া নির্জনেও আমরা পাপ করিতাম না এবং (২) আল্লাহ আমাদিগকে সামান্য জীবিকা দিলেও আমরা উহাতে সন্তুষ্ট থাকিতাম।" ফিরিশ্‌তাগণ বলিবে– 'কেন হইবে না? এই শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদেরই প্রাপ্য।"

হযরত মূসা আলায়হিস সালামের নিকট কতক লোকে নিবেদন করিলেন–'আপনি আল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করুন, কিসে তাঁহার সন্তুষ্টি লাভ করা যায় যেন আমরা তদনুরূপ আমল করিতে পারি।" ওহী আসিল–"তোমরা আমার কার্যে সন্তুষ্ট থাক; যাহা হইলে আমিও তোমাদরে উপর সন্তুষ্ট থাকিব।" হযরত দাঊদ আলায়হিস সালামের উপর আল্লাহ্ ওহী অবতীর্ণ করিলেন–"সাংসারিক দুশ্চিন্তায় আমার বন্ধুগণের কোন লাভ নাই বরং সাংসারিক দুশ্চিন্তা তাহাদের অন্তর হইতে মুনাজাতের মাধুর্য দূর করে। হে দাঊদ, আমি আমার বন্ধুদের সম্বন্ধে ইহাই পছন্দ করি যে, তাহারা যেন রূহানী হইয়া থাকে অর্থাৎ পারলৌকিক ব্যাপারে সচেষ্ট থাকে, সংসারের কোন চিন্তা না করে এবং সংসারে যেন মন না লাগায়।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ বলেন–"আমি এমন আল্লাহ যে আমা ব্যতীত কোন আল্লাহ্ নাই। যে-ব্যক্তি আমার প্রদত্ত বিপদে সবর ও সম্পদে শোকর না করিবে সে আমার বিধানে সন্তুষ্ট থাকিবে না। তাহাকে অন্য আল্লাহ্‌র অনুসন্ধান করিতে বলিয়া দিন।" তিনি ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ বলেন–"আমি তকদীর অর্থাৎ ভাগ্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি এবং তদবীর অর্থাৎ উপায়ও স্থির করিয়া রাখিয়াছি এবং আমার সৃষ্টিকে অটল করিয়া দিয়াছি; আর যাহা কিছু হইবে সকলই বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। যে-ব্যক্তি উহাতে সন্তুষ্ট থাকে আমিও তৎপ্রতি সন্তুষ্ট থাকি; আর যে অসন্তুষ্ট হয়, আমি তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হই। আমার সেই ক্রোধ সে দেখিতে পাইবে।" তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ বলেন–"আমি মঙ্গল ও অমঙ্গল সৃষ্টি করিয়াছি। মঙ্গলের জন্য যাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং মঙ্গল লাভ করা যাহার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যশালী। আর যাহাকে অমঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি এবং অমঙ্গল যাহার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি সেই ব্যক্তিই দুর্ভাগ্যগ্রস্ত। যে-ব্যক্তি ইহাতে তর্কবিতর্ক করে তাহার জন্য আফসোস।" এক নবী আলায়হিস সালাম বিশ বৎসর যাবত দরিদ্রতার পীড়নে, অন্ন-বস্ত্রের কষ্টে এবং নানারূপ মসীবত ও দুঃখ-যন্ত্রণায় জর্জরিত ছিলেন। অথচ তাঁহার দু'আ আল্লাহ্‌র দরবারে কবূল হইতেছিল না। অবশেষে ওহী অবতীর্ণ হইল–'আসমান-যমীন পয়দা করিবার পূর্বে তোমার অদৃষ্টে ইহাই নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছি। তুমি কি চাও, তোমার জন্য আমি আসমান-যমীন ও সমস্ত বিশ্বরাজ্য আবার নূতনভাবে পয়দা করি এবং আমি যাহা বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি তাহার পরিবর্তন করিয়া ফেলি যাহাতে তুমি যাহা চাও তাহাই সংঘটিত হয়? আর তোমার ইচ্ছানুরূপ কাজ হউক এবং আমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ না হউক? আমি নিজ গৌরবের শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার অন্তরে পুনরায় ঐরূপ চিন্তার উদয় হইলে তোমার নাম পয়গম্বরগণের তালিকা হইতে কাটিয়া দিব।"

হযরত আনাস (রা) বলেন–"আমি পূর্ণ বিশ বৎসর রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমত করিয়াছি। (এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে) আমি যাহা করিয়াছি তজ্জন্য তিনি আমাকে তখনও এই কথা বলেন নাই যে, 'তুমি ইহা কেন করিলে?' আর যাহা করি নাই তজ্জন্যও তিনি কখনও বলেন নাই যে, 'তুমি ইহা কেন কর নাই?' বরং অপর কেহ (ঐ বিষয় লইয়া) আমার

সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইলে তিনি বলিতেন, আল্লাহ্‌র বিধানে অন্যরূপ বিধিবদ্ধ হইলে তদ্রূপই হইত।" হযরত দাউদ আলায়হিস সালামের উপর ওহী অবতীর্ণ হইল–"হে দাউদ, তুমি যাহা ইচ্ছা কর, আমি কিন্তু অন্যরূপ ইচ্ছা করি। আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহাই হইবে। তুমি আমার ইচ্ছাতে সন্তুষ্ট থাকিলে তুমি যাহা চাও তাহাও দিব। কিন্তু অসন্তুষ্ট হইলে তোমার আকাঙ্ক্ষাতে তোমাকে দুঃখিত করিয়া রাখিব; আর কাজ ত আমার ইচ্ছানুরূপই হবে।" হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেন–"আল্লাহ্‌র বিধানে যাহা নির্ধারিত আছে তাহা যেরূপই হউক না কেন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট আছি।" এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনি কি পাইতে চাহেন?" তিনি বিললেন –"যাহা আল্লাহ্‌র বিধানে নির্ধারিত আছে তাহাই চাই।"

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন–"যাহা হয় নাই তাহা হইলে বড় ভাল হইত এবং যাহা হইয়াছে তাহা না হইলে উত্তম হইত' এরূপ বলা অপেক্ষা অগ্নি উদরস্থ করা আমি অধিক পছন্দ করি।" বানী ইসরাঈল বংশের এক বড় আবিদ বহু বৎসর ধরিয়া কঠোর পরিশ্রমে ইবাদত করিতে ছিলেন। একদা তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিতেছেন–'অমুক মহিলা বেহেশতে তোমার সঙ্গিনী হইবে।" আবিদ সেই মহিলার ইবাদত জানিবার জন্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুসন্ধানে তিনি জানিতে পারিলেন যে, সেই মহিলা শরীয়ত নির্ধারিত অতীব আবশ্যক ইবাদত ব্যতীত রাত্রি জাগিয়া নামায পড়িতেন না বরং নফল রোযাও রাখিতেন না। আবিদ মহিলাকে তাঁহার কার্যকলাপ জানাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহিলা বলিলেন–"আপনি যাহা দেখিলেন তাহা ব্যতীত আমার অপর কোন ইবাদত নাই।' আবিদ বহু অনুরোধ করিলে তিনি চিন্তা করিয়া বলিতে লাগিলেন–'আমার একটা অভ্যাস আছে। আমি রোগে ও বিপদে নিপতিত হইলে নিরাময় হইতে ও আরাম পাইতে চাই না। রৌদ্রে পড়িলে ছায়া পাইতে চাই না এবং ছায়াতে থাকিলেও রৌদ্রের আশা করি না। আল্লাহ আমার অদৃষ্টে যে-ব্যবস্থা করেন তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকি।" আবিদ স্বীয় মস্তকে হাত রাখিয়া বলিলেন–"ইহা সামান্য অভ্যাস নহে; অতি শ্রেষ্ঠ অভ্যাস।

সন্তোষের পরিচয়– কেহ কেহ বলেন বিপদাপদে ও অভিলাষের বিপরীত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা অসম্ভব; তবে উহাতে সবর করা যাইতে পারে। তাঁহাদের এই ধারণা ভুল। মহব্বত প্রবল হইলে অভিলাষের বিপরীত বিষয়ে দুই কারণে সন্তুষ্ট থাকা সম্ভব।

প্রথম কারণ– মহব্বত নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠলে মানব যখন একেবারে উদ্ভ্রান্ত হইয়া প্রিয়জনের খেয়ালে নিমজ্জিত থাকে তখন শারীরিক কষ্ট ও বেদনা অনুভূত হয় না। রণক্ষেত্রে বীরপুরুষ যুদ্ধ জয়ের আশায় বিপক্ষকে যখন হত্যা করিতে ধাবিত হয় তখন অস্ত্রের আঘাতে আঘাতে শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইলেও স্বীয় দেহে রক্ত না দেখা পর্যন্ত সে বেদনা অনুভব করে না। লোভনীয় বস্তু পাওয়ার আশায় দৌড়াইবার সময়ে পায়ে কাটা বিঁধিলে মানুষ টেরও পায় না। ভয়, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ উত্তেজনায় বিচলিত হইয়া চলিবার কালে লোকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভুলিয়া যায়। সাধারণ মানুষের প্রতি মহব্বত এবং দুনিয়ার লোভে ইহা সম্ভব হইলে আল্লাহ্‌র মহব্বতে এবং পরকালের সৌভাগ্য-লোভে ইহা অসম্ভব হইবে কেন? ইতঃপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বাহ্যসৌন্দর্য অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট। কারণ যাহা আকৃতি চর্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই তাহা দ্বারা অশ্বকেও সুশোভিত করা হইয়াছে। যে-অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বুঝা যায়, তাহা চর্মচক্ষু অপেক্ষা বহুগুণে অধিক উজ্জ্বল। কেননা, চর্মচক্ষু অধিকাংশ সময়ে ভুল দেখে; ইহা কখন বড় জিনিসকে ছোট, আবার কখন দূরকে নিকট বলিয়া দেখিতে পায়।

দ্বিতীয় কারণ– দুঃখ-কষ্ট ত অনুভূত হয়, কিন্তু প্রিয়তমের প্রদত্ত বলিয়া সন্তোষের সহিত সহ্য করা হয়। প্রিয়জন প্রেমিকের দেহ হইতে রক্ত বাহির করিতে বা তিক্ত ঔষধ সেবক করিতে আদেশ দিলে তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে উহার কষ্টও সে সন্তোষের সহিত বরণ করিয়া লয়। তদ্রূপ যদি বুঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র আদেশে সন্তুষ্ট থাকিলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন তবে তাঁহার প্রদত্ত দরিদ্রতা, রোগ-শোক, কষ্ট, বিপদাপদে বান্দা সন্তুষ্ট থাকিবে। দুনিয়াদার লোভী ব্যক্তি যেমন বাণিজ্যার্থ দেশ পর্যটনের পরিশ্রম, সমুদ্র-যাত্রার ভয় এবং আরও বহুবিধ দুঃখ-যন্ত্রণা সন্তোষের সহিত সহ্য করে পারলৌকিক সৌভাগ্য-লোভী ব্যক্তিও তদ্রূপ কষ্ট সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়া থাকে।

সন্তোষের দৃষ্টান্ত ও বুযুর্গগণের উক্তি – বহু আল্লাহ্-প্রেমিক সন্তোষের উচ্চ মরতবা লাভে ধন্য হইয়াছে। হযরত ফতেহ মুসেলীর (র) স্ত্রীর নখ নিষ্পেষিত হইয়া খসিয়া গেল, অথচ সেই অবস্থায়ও তিনি হাসিতেছিলেন। হযরত ফতেহ্ মুসেলী (র) জিজ্ঞাসা করিলেন–"কেন, ইহাতে কি তুমি বেদনা অনুভব করিতেছ না" তিনি বলিলেন–"সওয়াবের আনন্দে আমার মন এত উৎফুল্ল হইয়াছে যে,

বেদনা ভুলিয়া গিয়াছি।" হযরত সহল তস্তরীর (র) দেহে ব্যথা ছিল। তিনি ইহার চিকিৎসা করিতেন না। লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন–"বুদ্ধগণ, তোমরা কি জান না যে বন্ধুর প্রদত্ত জখমে বেদনা নাই?" হযরত জুনায়দ (র) বলেন–"আমি হযরত সররি সকতিকে (র) জিজ্ঞাসা করিলাম–"আল্লাহ্-প্রেমিক কি বিপদে দুঃখিত হন?" তিনি বলিলেন–'না।" আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম– 'যদি তাহাকে তলওয়ার দ্বারা আঘাত করা হয়?' তিনি বলিলেন–এক আঘাত কেন, সত্তর আঘাত করিলেও প্রেমিক দুঃখিত হয় না।" এক আল্লাহ্-প্রেমিক বলেন–"আল্লাহ্ যাহা ভালবাসেন আমিও তাহাই ভালবাসি। আল্লাহ আমাকে দোযখে নিক্ষেপ করিতে চাহিলেও আমি সন্তুষ্ট আছি এবং তিনি সন্তুষ্ট থাকিলে দোযখই আমি পছন্দ করিব।

হযরত বিশ্‌রে হাফী (র) বলেন–"বাগদাদে এক ব্যক্তিকে এক হাজার বার লাঠি দ্বারা আঘাত করা হইয়াছিল, তথাপি তিনি 'ওহ' শব্দটি পর্যন্ত বলেন নাই। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম–'ওহে তুমি একটি কথাও বলিলে না কেন?' সেই ব্যক্তি বলিতে লাগিল–'আমার প্রিয়তম আমার সম্মুখে থাকিয়া দেখিতেছিলেন।" আমি বলিলাম–'তুমি তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিতে পাইলে কি করিয়া?' ইহা শুনামাত্র সেই ব্যাক্তি এক চিৎকার দিয়া মরিয়া গেল।" হযরত বিশ্‌রে হাফী (র) অন্যত্র বলেন–"মুরীদ হওয়ার প্রথম ভাগে আমি আবাদান নগরে যাইতেছিলাম। দেখিতে পাইলাম, এক উন্মত্ত কুষ্ঠরোগী ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছেন। পিপীলিকা তাহার দেহের মাংস খাইতে ছিল। দয়ার্দ্র হইয়া আমি তাহার মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে লইলাম। কিন্তু চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলে তিনি বলিতে লাগিলেন ঃ 'এ কেমন বেহুদা কাজ! আমার ও আমার প্রভুর মধ্যে অন্যের অধিকার চর্চা।

কুরআন শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালামকে যেই সকল মহিলা দর্শন করিয়াছিলেন তাহারা তাঁহার রূপ-লাবণ্যে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা নিজেদের হস্তাঙ্গুলী কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন, অথচ তাঁহারা উহা টেরও পান নাই। সেইকালে মিসর দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। লোকে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িলে হযরত ইউসুফ আলায়হিস সালামকে দেখিতে যাইত এবং তাহার রূপমাধুরী দর্শনে মোহিত হইয়া ক্ষুধার জ্বালা ভুলিয়া যাইত। আল্লাহ্‌র একজন সৃষ্ট মানবের এরূপ প্রভাব।

এমতাবস্থায় যাহার অদৃষ্টে আল্লাহ্‌র অনন্ত সৌন্দর্য প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে সেই ব্যক্তি বিপদাপদের কষ্ট ভুলিয়া যাইবে তাহাতে আশ্চর্য কি?

জনৈক ব্যক্তি এক অরণ্যে বাস করিতেন। আল্লাহ্ যাহা করেন তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিতেন–"ইহাতেই মঙ্গল রহিয়াছে।" তাঁহার একটি কুকুর ছিল, সে প্রভুর দ্রব্যসামগ্রী পাহারা দিত। একটি গর্দভ ছিল, সে প্রভুর দ্রব্যজাত বহন করিত; একটি মোরগ ছিল, সে রজনী প্রভাতের সংবাদ দিত। ইতিমধ্যে এক ব্যাঘ্র আসিয়া গর্দভটি মারিয়া ফেলিল। সেই ব্যক্তি বলিলেন–"ইহাতেই মঙ্গল আছে।" তৎপর কুকুর মোরগটিকে হত্যা করিল। সেই ব্যক্তি বলিলেন–"ইহাতেই মঙ্গল রহিয়াছে।" অবশেষে সেই কুকুরটিও মরিয়া গেল। গৃহস্বামী এবারও বলিলেন–"ইহাতেও মঙ্গল আছে।" তাঁহার পরিবার লোকজন বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল–"যত দুর্ঘটনাই ঘটুক না কেন, তুমি বল–ইহাতেই মঙ্গল আছে।' এ আবার কেমন কথা? এই কয়েকটি প্রাণী আমাদের হস্তপদের কাজ করিত। সবই ধ্বংস হইল।" সেই ব্যক্তি পুনরায় বলিলেন–"ইহাতেই মঙ্গল আছে।" প্রত্যুষে উঠিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, দস্যুদল তাঁহাদের পাড়া-প্রতিবেশী প্রত্যেককে হত্যা করিয়া ধন-সম্পত্তি লুটিয়া লইয়া গিয়াছে। সেই ব্যক্তির বাড়ি বৃক্ষের অন্তরালে ছিল। কুকুর ও মোরগের কোন শব্দ না পাইয়া দস্যুদল সেই বাড়ির সন্ধান পায় নাই। সুতরাং পরিবারবর্গের ধন ও প্রাণ রক্ষা পাইল। তখন গৃহস্বামী তাঁহার পরিবার পরিজনকে বলিলেন–"তোমরা দেখিলে? কোন কার্যে মঙ্গল তাহা আল্লাহ্‌ই জানেন।"

হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম একদা এক কুষ্ঠরোগাক্রান্ত অন্ধ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দেহের উভয় পার্শ্ব অবশ, হস্তপদ অকর্মণ্য ছিল; অথচ তিনি আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিয়া বলিতেছিলেন–"হে আল্লাহ্, তুমি বহু লোককে যে-সকল বিপদাপদে নিপতিত রাখিয়াছ, তোমাকে ধন্যবাদ দেই যে, আমাকে উহা হইতে রক্ষা করিয়াছ।" হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"এমন কোন বিপদ আছে যাহা হইতে আল্লাহ্ তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন?" সেই ব্যক্তি বলিলেন– "আল্লাহ্ সম্বন্ধে যে-জ্ঞান তিনি দয়া করিয়া আমার অন্তরে জন্মাইয়া দিয়াছেন ততটুকু জ্ঞান যাহার অন্তরে তিনি দান করেন নাই তাহা অপেক্ষা আমি নিরাপদে আছি।" হযরত ঈসা (আ) বলিলেন–"তুমি সত্য বলিয়াছ" এবং তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন ও তাঁহার দেহে হস্ত বুলাইরেন।

সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সকল পীড়া হইতে নিরোগ হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন; তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইল এবং তিনি দৃষ্টিশক্তি লাভ করিলেন। তিনি অবশিষ্ট জীবন হযরত ঈসার (আ) সহিত থাকিয়া ইবাদত করিতেন।

হযরত শিবলীকে (র) লোকে পাগল মনে করিয়া চিকিৎসালয়ে রাখিয়াছিল। কতক লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কে?" তাহারা উত্তর দিল–"আপনার বন্ধু।" ইহা শুনিয়া তিনি তাঁহাদের দিকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল। তখন তিনি তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন–"তোমরা আমার বন্ধু বলিয়া মিথ্যা দাবী করিতেছ। তোমরা আমার বন্ধু হইলে আমার প্রদত্ত দুঃখ প্রফুল্লচিত্তে সহ্য করিতে।"

সন্তোষ সম্বন্ধে ভুল ধারণা – (১) কোন কিছুর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ না করা, (২) অভাব মোচনের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট না চাওয়া, (৩) যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা, (৪) পাপ-কার্য আল্লাহ্‌র আদেশে হইতেছে বিবেচনায় ইহাকে মন্দ বলিয়া না জানা এবং (৫) যে-স্থানে পাপ-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে অথবা প্রবল মড়ক লাগিয়াছে তাহাও আল্লাহ্‌র বিধানে ঘটিতেছে মনে করিয়া তথা হইতে পলায়ন না করা–এই সকলকেই কেহ কেহ সন্তোষের শর্ত বলিয়া মনে করেন। অথচ এইরূপ ধারণা পোষণ করা ভুল। কারণ, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াস সাল্লামও দু'আ করিয়াছেন এবং অপর লোককেও দু'আ করিবার উৎসাহ দিয়া বলিয়াছেন–"দু'আ ইবাদতের মগজ।" বাস্তবপক্ষে দু'আর প্রভাব মানব মনে নম্রতা, দীনহীনতা, আল্লাহ্ নিকট অনুনয়-বিনয় ও আত্মনিবেদন ইত্যাদি সদগুণাবলীর সৃষ্টি হয়। পিপাসা নিবারণের জন্য পানি পান, ক্ষুধা দূর করিবার নিমিত্ত আহার, শীত নিবারণের উদ্দেশ্যে শীতবস্ত্র পরিধান যেরূপ সন্তোষের বিরোধী নহে তদ্রূপ বিপদাপদ দূর হওয়ার জন্য দু'আ করাও সন্তোষের বিপরীত নহে। বরং আল্লাহ্ যে পদার্থকে যে-কার্যের কারণস্বরূপ সৃজন করিয়া উহা অবলম্বনের আদেশ দিয়াছেন সেই স্থলে উহা ব্যবহার না করাই সন্তোষের বিপরীত। তৎপর পাপকে মন্দ বলিয়া না জানা এবং পাপ-স্রোত দর্শনে তুষ্ট থাকা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? কারণ পাপের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা নিষেধ। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে-ব্যক্তি পাপের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবে সে পাপের অংশ ভোগী হইবে।" তিনি অন্যত্র বলেন–"সুদূর পূর্বদেশে যদি কেহ কাহাকেও অন্যায়ভাবে হত্যা

করে এবং সুদূর পশ্চিম দেশের কোন অধিবাসীও এই হত্যা কার্যে সন্তুষ্ট থাকে তবে সে নরহত্যার সহযোগী।"

পাপ যদিও আল্লাহ্‌র বিধানচক্রের অন্তর্গত তথাপি ইহার দুইটা দিক আছে। একদিকে ইহা মানুষের দিকে সম্বন্ধে যুক্ত। ইহার অর্থ এই যে, পাপ করা না করার ক্ষমতা মানুষের আছে এবং পাপকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করা মানুষের স্বাভাবিক গুণ; এই গুণ আল্লাহ্‌র গুণরাজির অন্তর্ভুক্ত। পাপের অপর দিক আল্লাহ্‌র দিকে প্রসারিত। কারণ, ইহা আল্লাহ্‌র বিধানে এবং তাঁহার বিধিবদ্ধ নিয়মে নির্বাহ হইয়া থাকে। আর তিনি এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, ইহজগত কখনও পাপ এবং নাস্তিকতাশূন্য হইবে না। এই হিসাবে পাপ দেখিয়া সহ্য করিয়া যাওয়া আবশ্যক। অপর পক্ষে, পাপ করা, না করার ক্ষমতা মানুষের আছে এবং আল্লাহ্ পাপকে ঘৃণা করেন, এই দ্বিবিধ কারণে পাপের প্রতি মানুষের ঘৃণা থাকাও আবশ্যক।

আল্লাহ্‌র বিধান-শৃঙ্খলা দৃষ্টে পাপ সহ্য করা এবং মানুষের স্বাধীন ক্ষমতা দৃষ্টে পাপের প্রতি ঘৃণা করা সহজ দৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হইলেও বিরুদ্ধ নহে। ইহা বুঝাইবার জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। মনে কর, এক ব্যক্তির শত্রু মরিয়া গেল; কিন্তু সে তাহার শত্রুরও শত্রু ছিল। এমতাবস্থায় সে দুঃখিতও হইবে এবং আনন্দিতও হইবে। শত্রু মরিয়াছে বলিয়া সে আনন্দিত হইবে এবং শত্রুর শত্রু মরিয়াছে বলিয়া দুঃখিত হইবে। একই কারণে আনন্দ ও দুঃখ হইলেই পরস্পর-বিরোধী হইত। এইরূপেই বুঝিয়া লও যে, যে-স্থলে পাপ-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তথা হইতে পলায়ন করা আবশ্যক; যেমন আল্লাহ্ বলেন

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا –

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্ আমাদিগকে এই গ্রাম হইতে বাহির কর; এ-স্থানের অধিবাসিগণ অত্যাচারী।" (সূরা নিসা, রুকূ ১০, পারা ৫।) কোন স্থানে পাপের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে পূর্বকালের বুযুর্গগণ সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন। কারণ, পাপের প্রভাব মানব-হৃদয়ে অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করে। পাপের প্রভাব মানব-হৃদয়ে প্রবেশ না করিলেও ইহার বিপদাপদ পাপী ও নেককার সকলের উপরই নিপতিত হয়; যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَاتُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً –

অর্থাৎ "পাপের বিপদ হইতে সভয়ে দূরে সরিয়া থাক; কারণ তোমাদের মধ্যে যাহারা পাপ করে কেবল তাহাদের উপরই বিপদ পতিত হইবে না।" (সূরা আনফাল, রুকূ ৩, পারা ৯।)

যে-স্থানে অবস্থান করিলে পরস্ত্রীর উপর দৃষ্টি পড়ে তথা হইতে সরিয়া যাওয়া আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার বিপরীত নহে। এইরূপ, যে-নগরে খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হয় ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তথা হইতে বাহির হইয়া যাওয়া জায়েয আছে। কিন্তু যে-স্থানে মড়ক লাগে তথা হইতে পলায়ন করা নিষিদ্ধ। কারণ, সুস্থ লোক সেই স্থান হইতে পলাইয়া গেলে পীড়িত লোক সেবা-শুশ্রূষার অভাবে কষ্ট পাইয়া মারা পড়ে। তবে মড়ক ভিন্ন অন্য বিপদাপদ হইতে সরিয়া থাকা নিষিদ্ধ নহে। বরং আল্লাহ্‌র আদেশ অনুযায়ী এই সকল বিপদাপদ হইতে মুক্তি পাওয়ার উপায় অবলম্বন করা উচিত। উপায় অবলম্বনের পর যাহা ঘটে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক এবং মনে করা উচিত যে, ইহাতেই মঙ্গল নিহিত আছে।

দশম অধ্যায়

মৃত্যু-চিন্তা

মৃত্যু-চিন্তার ফযীলত– আমাদের পরিণাম মৃত্যু, কবর আমাদের বাসস্থান, মনকীর ও নকীর আমাদিগকে কবরে প্রশ্ন করিবে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী এবং পরিশেষে আমাদিগকে বেহেশতে বা দোযখে যাইতে হইবে, এই বিষয়গুলি যে ব্যক্তি উত্তমরূপে জানিয়া হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া লইয়াছে তাহার সামান্যমাত্র বুদ্ধি থাকিলেও সে মৃত্যু-চিন্তাই সবচেয়ে বেশী করিবে এবং আখিরাতের সম্বল সংগ্রহেই সর্বাদিক চেষ্টা করিবে; যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন –"যে-ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তিকে বশীভূত করিয়াছে এবং পরকালের জন্য আমল করিয়াছে সে-ই বুদ্ধিমান।" যে-ব্যক্তি অধিক পরিমাণে মৃত্যু-চিন্তা করে স্বভাবত সে পরকালের সম্বল সংগ্রহে লিপ্ত থাকিবে এবং মৃত্যুর পর কবরকে বেহেশতের বাগানসমূহের ন্যায় সর্বদা বাসন্তিক সৌন্দর্যে বিভূষিত একটি বাগানরূপে পাইবে। অপর পক্ষে, যে-ব্যক্তি মৃত্যুকে ভুলিয়া থাকিবে, সে দুনিয়াতে লিপ্ত হইয়া পরকারের পাথেয় সঞ্চয়ে উদাসীন থাকিবে এবং কবরকে দোযখের অগ্নিকুণ্ডসমূহের অন্যতম অগ্নিকুণ্ড রূপে পাইবে। এই জন্যই মৃত্যু-চিন্তার এত অধিক ফযীলত।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"তোমরা সকল আনন্দ-বিনাশকারীর (অর্থাৎ মৃত্যুর) চিন্তা অধিক পরিমাণে কর।" তিনি বলিলেন–'তোমরা মৃত্যু অবস্থা যেরূপ জান, পশুপক্ষী যদি তদ্রূপ জানিত তবে কোন লোকের ভাগ্যে আর স্থূলকায় প্রাণীর গোশ্‌ত ভক্ষণ ঘটিত না।" অর্থাৎ মৃত্যু-চিন্তায় ইহারা মোটা-তাজা হইতে পারিত না। হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, শহীদদের মরতবা কি কেহ পাইত পারে?" তিনি বলিলেন–"হাঁ, যে-ব্যক্তি প্রত্যহ বিশ বার মৃত্যুকে স্মরণ করিবে সে পাইতে পারিবে।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক দল লোকের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহারা উচ্চহাস্য করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন–"হে লোকগণ, তোমাদের এই সভাতে এমন বিষয়ের আলোচনা

কর যাহা সকল আনন্দ বিনাশ করিয়া দেয়।" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন–"উহা কি?" তিনি বলিলেন–"মৃত্যু।"

হযরত আনাস (রা) বলেন– রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন– "হে আনাস, অধিক পরিমাণে মৃত্যু-চিন্তা কর। উহা তোমাকে পৃথিবীতে সংসারবিরাগী বানাইবে এবং তোমার গোনাহ্‌র কাফ্‌ফারা হইবে।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ كَفٰى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا – অর্থাৎ "মানবের উপদেশের জন্য মৃত্যুই যথেষ্ট।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে সাহাবাগণ এক ব্যক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন–"আচ্ছা বল ত, মৃত্যুর কথা তাহার হৃদয়ে কিরূপ আছে?" তাঁহারা নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহর রাসূল, আমরা মৃত্যুর আলাপ তাহার মুখে শুনি নাই।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন–"তোমরা যেমন জান সেই ব্যক্তি তেমন নহে।" হযরত ইবনে ওমর (র) বলেন–"আমি অপর দশজন লোকসহ রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম। জনৈক আনসার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"যে-ব্যক্তি অধিক পরিমাণে মৃত্যু-চিন্তা করে এবং পরকালের সম্বল সঞ্চয়ে অধিক লোলুপ থাকে, সেই-ই দুনিয়াতে সম্মান লাভ করে ও পরকালে উচ্চ মর্যাদা পায়।"

হযরত ইবরাহীম তাইমী (র) বলেন–"দুই বস্তু আমার মন হইতে দুনিয়ার শান্তি হরণ করে; প্রথম-মৃত্যুকে স্মরণ ও দ্বিতীয়–আল্লাহ্‌র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার ভয়।" হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) প্রতি রাত্রে আলিমগণকে একত্র করিয়া মৃত্যু ও কিয়ামতের বিষয় শ্রবণ করিতেন এবং মৃতদেহের নিকট শোকার্ত লোকে যেমন রোদন করে তিনিও তদ্রূপ রোদন করিতেন। হযরত হাসান বসরী (র) লোকের সঙ্গে বসিলে কেবল মৃত্যু, দোযখ এবং আখিরাতের বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতেন। এক মহিলা হযরত আয়েশার (র) নিকট স্বীয় কঠিন হৃদয়ের অভিযোগ করিলেন। তিনি তাহাকে অধিক পরিমাণে মৃত্যু-চিন্তা করিতে আদেশ দিলেন। সেই মহিলা তাহাই করিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার হৃদয় হইতে ক্রমেই কাঠিন্য বিদূরিত হইতেছে। অবশেষে তিনি হযরত আয়েশার (র) নিকট গিয়া হৃদয়ে কোমলতা প্রাপ্তির জন্য ধন্যবাদ দিলেন। হযরত রবী খায়সাম (র) নিজ গৃহে এক কবর খনন করিয়া

লইয়াছিলেন। প্রত্যহ কয়েকবার সেই কবরে প্রবেশ করত তিনি মৃত্যু-চিন্তা করিতেন এবং বলিতেন–"ঘণ্টাকাল মৃত্যু-চিন্তা না করিলে আমার মন মলিন হইয়া যাইত।" হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) এক ব্যক্তিকে বলিলেন– "অধিক পরিমাণে মৃত্যু-চিন্তা কর; ইহাতে দুইটি উপকার আছে– (১) তুমি দুঃখ দারিদ্রে নিপতিত থাকিলে তোমার মনে শান্তি আসিবে; আর (২) তুমি ধন-সম্পদের আরামে ডুবিয়া থাকিলে উহা তোমার নিকট তিক্ত হইয়া উঠিবে।" হযরত আবূ সুলায়মান দারানী (র) বলেন– "আমি হারূনের আম্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম–"আপনি কি মৃত্যু ভালবাসেন?' তিনি বলিলেন–'না।" আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম –'ইহার কারণ কি?" তিনি বলিলেন–আমি কাহারও নিকট অপরাধ করিলে তাহার সহিত সাক্ষাত করিতে চাই না। আমি আল্লাহ্‌র নিকট বহু অপরাধ করিয়াছি। এমতাবস্থায় কিরূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করি?"

মৃত্যু-চিন্তাধারা–লোক-ভেদে মৃত্যু-চিন্তা ত্রিবিধ হইয়া থাকে।

প্রথম ধারা ঃ পরকালের প্রতি উদাসীন, সংসারে মত্ত লোকের মৃত্যু–চিন্তা। এই শ্রেণীর লোকে মৃত্যু-চিন্তা করিয়া তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট হয় এবং ভয় করে যে, মৃত্যু তাহাদিগকে সংসারের সকল সম্ভোগ ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিবে। তাহারা মৃত্যুকে গালি দিয়া বলে– "মৃত্যুরূপ আপদ ক্রমশ নিকটে আসিতেছে। হায়! ইহা আমাদের হাত হইতে এমন সুখের দুনিয়া কাড়িয়া লইবে।" এই প্রকার মৃত্যু-চিন্তা মানুষকে আল্লাহ্‌ হইতে অধিকতর দূরবর্তী করে। কিন্তু কোন কারণে দুনিয়া যদি মন্দ বলিয়া মনে হয় এবং দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা জন্মে তবে উপকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে না।

দ্বিতীয় ধারা ঃ তওবাকারীর মৃত্যু-চিন্তা। তাহাদের মনে পরকালের ভয় প্রবল হয় এবং অধিকাংশ সময় তওবা ও অতীত পাপের ক্ষতিপূরণে প্রবৃত্ত থাকে বলিয়া তাহারা মৃত্যু-চিন্তা করে। এইরূপ মৃত্যু-চিন্তা বড় সওয়াবের কাজ। তাহারা মৃত্যুকে অপছন্দ করে না, বরং মৃত্যুর শীঘ্র আগমন অপছন্দ করে। কারণ, শীঘ্র মৃত্যু ঘটিলে পরকালের পাথেয় সংগৃহীত হইবার পূর্বেই দুনিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই ভয়ে কেহ মৃত্যুকে অপ্রিয় মনে করিলে ইহাতে কোন দোষ নাই।

তৃতীয় ধারা ঃ আরিফগণের মৃত্যু-চিন্তা। আল্লাহ্‌র দীদার মৃত্যুর পরে ঘটিবে

এবং বন্ধু যে-সময় দর্শন দান করিবেন বলিয়া ওয়াদা করিয়াছেন সেই সময়টি কেহই ভুলিতে পারে না। সর্বদা তাহার প্রতীক্ষা করিতে থাকে। বরং সেই শুভ মুহূর্ত শীঘ্র আগমনের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। এইজন্যই আরিফগণ মৃত্যুকে স্মরণ করিয়া থাকেন। যেমন হযরত হুযায়ফা (রা) মৃত্যুর সময় বলিয়াছেন حَبِيْبٌ جَاءَ عَلٰى فَاقَةٍ – অর্থাৎ "বন্ধু প্রয়োজনের সময়েই আসিয়া পড়িলেন।" তৎপর তিনি মুনাজাত করিলেন–"হে আল্লাহ্, তুমি যদি জান যে, আমি সম্পদ অপেক্ষা অভাবকে অধিক ভালবাসি, সুস্থাবস্থা অপেক্ষা পীড়িতাবস্থা পছন্দ করি এবং জীবন অপেক্ষা মরণকে অধিক ভালবাসিয়া থাকি তবে মৃত্যু আমার নিকট সহজ কর। তাহা হইলে আমি তোমার দর্শনে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব।" অধ্যাত্মিক উন্নতির এই দরজা অপেক্ষা অতি উন্নত আর একট দরজা আছে। এই দরজায় উপনীত হইলে মানব মৃত্যুর প্রতি অসন্তুষ্টও থাকে না বা সন্তুষ্ট হইয়া শীঘ্র মৃত্যু কামনাও করে না। এই শ্রেণীর লোকে মৃত্যু শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, ইহার কোনটিই কামনা করেন না। বরং তাঁহারা আল্লাহ্‌র আদেশে সন্তুষ্ট থাকেন এবং নিজের স্বাধীন ক্ষমতা ও পছন্দ একেবারে বিসর্জন দিয়া থাকেন। তাঁহারাই তসলীম ও রেযার চরম উন্নত শিখরে উপনীত হন। এই অবস্থায় উন্নীত হইলে মৃত্যুর স্মরণ হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই ইহার খেয়াল আসে না। কারণ, এই জগতেই তাঁহারা জ্ঞানচক্ষে আল্লাহকে দেখিতে থাকেন; আল্লাহ্‌র যিকির তাঁহাদের অন্তর-রাজ্য তন্ময় করিয়া রাখে এবং জীবন-মরণ তাঁহাদের নিকট সমান বলিয়া বোধ হয়। এইজন্য সর্বদা তাঁহারা আল্লাহ্‌র যিকির ও মহব্বতে ডুবিয়া থাকেন।

মৃত্যু-চিন্তার প্রভাব অন্তরে জন্মাইবার উপায়–মৃত্যু একটি গুরুতর বিষয় এবং মৃত্যকালে মানবের যে-ক্ষতি ঘটিতে পারে তাহার সীমা নাই। এই বিষয়ে লোকে নিতান্ত উদাসীন। কেহ কখন মৃত্যুর কথা স্মরণ করিলেও ইহা তাহার হৃদয়ে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কারণ দুনিয়ার কর্মব্যস্ততা তাহার হৃদয় এমন পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে যে, সেই হৃদয়ে অন্য কোন বস্তু স্থান পাইতে পারে না। এইজন্য সংসার-মুগ্ধ লোক আল্লাহ্‌র যিকির ও তসবীহের মাধুর্য ও আনন্দ পায় না। মৃত্যু-চিন্তার স্থায়ী প্রভাব মনে জন্মাইবার দুইটি উপায় আছে।

প্রথম উপায় –যাহাকে দুস্তর বিজন অরণ্য অতিক্রম করিতে হইবে সে যেমন সর্বদা ইহার উপায় উদ্ভাবন ও চিন্তায় ব্যস্ত থাকে এবং অপর কোন

জিনিসের চিন্তাই তাহার মনে স্থান পায় না, তদ্রূপ তুমিও প্রত্যহ কিছুকাল নির্জন স্থানে বসিয়া মন হইতে সংসারের সব খেয়াল দূর করিয়া দাও এবং আপন মনে চিন্তা কর–"মৃত্যু আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত। হয়ত অদ্যই মরিতে হইবে। হে মন, তোমাকে যদি কেহ অন্ধকারপূর্ণ পাতালপুরীতে যাইতে বলে আর তথায় যাওয়ার পথে গভীর গর্ত আছে, কি প্রস্তর পতিত আছে অথবা কোন ভয়ের কারণ আছে কিনা, জানা না থাকে তবে তোমার হৃদয়ের রক্ত পানি হইয়া যাইবে। মৃত্যুর পর তোমাকে এক ঘোর অন্ধকারে প্রবশ করিতে হইবে। তথায় তোমার অদৃষ্টে কি আছে এবং তোমাকে কোথায় পতিত হইতে হইবে, তাহা তুমি কিছুই জান না। কবরে তোমাকে কি বিপদে পড়িতে হইবে তাহাও অন্ধকারপূর্ণ পাতালপুরীতে প্রবেশ অপেক্ষা কম ভয়ের কথা নহে। এমতাবস্থায় মৃত্যু, কবর, পরকাল ইত্যাদি অজ্ঞাত বিপদের কথা কোন্ ভরসায় ভুলিয়া রহিলে?"

দ্বিতীয় উপায়–এই উপায় বিশেষ ফলপ্রদ। তোমার সময়ের যে সব লোক মরিয়া গিয়াছে তাহাদের কথা মনে কর। তাহারা কেমন জাঁকজমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির জীবন যাপন করিতেছিল, সংসারে কত সুখ-আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল এবং মৃত্যু সম্বন্ধে তাহারা কত উদাসীন ছিল। সেই মোহময় উদাসীনতার মধ্যেই আখিরাতের সম্বলহীন অবস্থায় হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া গেল। কবরে তাহাদের আকৃতি কেমন হইয়াছে, তাহাও একবার চিন্তা করিয়া দেখ। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পচিয়া গলিয়া একটি হইতে অপরটি খসিয়া পড়িযাছে; মাংস, চর্ম, চক্ষু, জিহ্বা ইত্যাদিতে কীট ধরিয়াছে। কবরে ত তাহাদের এই অবস্থা, কিন্তু এদিকে তাহাদের পরিত্যক্ত ধনসম্পত্তি ওয়ারিসগণ বণ্টন করিয়া লইয়া আরামের সহিত ভোগ করিতেছে; তাহাদের স্ত্রীগণ তাহাগিকে ভুলিয়া গিয়া অপর পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিয়া লইয়াছে এবং তাহাদের সহিত আমোদ-আহলাদে মত্ত রহিয়াছে। এইরূপে তোমার সমসাময়িক এক একটি মৃত লোকের কথা স্মরণ কর। তাহাদের জীবন-চরিত হাস্য-পরিহাস, মনোযোগিতা ও উদাসীনতা এবং কর্মব্যস্ততা লইয়া চিন্তা কর। তাহারা এমন এমন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল যে, বিশ বৎসরেও উহার পরিসমাপ্তি অসম্ভব এবং সেই কার্য করিতে গিয়া তাহারা গুরুতর দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছে। অথচ তাহাদের কাফনের কাপড় বস্ত্র বিক্রেতার দোকানে মৌজুদ

ছিল; কিন্তু উহার খবরও তাহারা জানিত না। এইরূপ চিন্তা করিয়া তুমি নিজকে বলিবে–"হে মন, তুমিও তাহাদেরই মত; তুমিও তাহাদের ন্যায় পরকালের প্রতি অমনোযোগী, সংসারলোভী ও নির্বোধ। তবে তোমার জন্য ইহা এক মহা সুযোগ যে, তাহারা তোমার সম্মুখে মরিয়া গিয়াছে যেন তুমি তাহাদের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে পার।" যে-ব্যক্তি অপরের অবস্থা দেখিয়া উপদেশ গ্রহণ করে সেই-ই ভাগ্যবান।

তৎপর নিজের হস্ত, পদ, চক্ষু, জিহ্বা, অঙ্গুলী ইত্যাদির পরিণাম চিন্তা কর। এই সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটি হইতে অপরটি খসিয়া পড়িবে। অল্প দিনের মধ্যেই এইগুলি পোকা, পিলীলিকার খাদ্য হইবে। ইহারা তোমার দেহ ভক্ষণ করিবে, কবরে তোমার দেহের কিরূপ বীভৎস অবস্থা হইবে তাহাও চিন্তা কর। তোমার এমন কমনীয় শরীর পচিয়া-গলিয়া মর-দেহে পরিণত হইবে।

এই সকল কথা এবং এই প্রকার বিষয় লইয়া প্রত্যহ কিছুক্ষণ চিন্তা করিবে। তাহা হইলে সম্ভবত মৃত্যু-চিন্তা তোমার মনে জাগ্রত থাকিবে। কারণ, শুধু মুখে 'মৃত্যু মৃত্যু' করিলে অন্তরে ইহার প্রভাব পড়ে না। লোকে সর্বদা মৃতদেহ কবরস্থ করিতে লইয়া যাইতেছে, তোমরা উহা স্বচক্ষে দেখিতেছ; অথচ তোমাকেও যে একদিন মরিতে হইবে, ইহা জানা সত্ত্বেও মৃত্যুর প্রভাব তোমার অন্তরে পড়িতেছে না। ইহার কারণ এই যে, তোমার উপর মৃত্যু সংঘটিত হইতে তুমি দেখ নাই এবং মানুষ যাহা নিজের উপর সংঘটিত হইতে দেখে নাই তাহা তাহার খেয়ালে আসে না। এইজন্যই রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক খুতবাতে বলিয়াছিলেন– "সত্য করিয়া বল দেখি, এই মৃত্যু কি আমাদের ভাগ্যে বিধিবদ্ধ হয় নাই? লোকে যে এই মৃতদেহ কবরে লইয়া যাইতেছে, সে কি পুনরায় ফিরিয়া আসিবে? মৃতদেহ কি করবে মাটি হইবে না? তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি কি তাহারা স্বয়ং ভোগ করিবে, অথচ (মৃত্যু সম্বন্ধে) কেন উদাসীন রহিলে?"

দীর্ঘ আশার কারণে লোকে মৃত্যুর কথা ভুলিয়া থাকে এবং এইজন্যই সর্বপ্রকার ফাসাদের সৃষ্টি হয়।

ক্ষুদ্র আশার ফযীলত –যে-ব্যক্তি মনে করে, 'আমি দীর্ঘ জীবন পাইয়াছি, বহুদিন মরিব না' তাহার দ্বারা পরকালের কোন কাজ হয় না। কারণ, সে মনে করে,–"এখনও বহুদিন আছে, যখন ইচ্ছা তখনই করিয়া লইব, এখন কিছুদিন

আমোদ-আহলাদে দিন কাটাই।" অপর পক্ষে যে-ব্যক্তি মৃত্যুকে নিকটবর্তী মনে করে, সে সর্বদা পরকালের কাজে লিপ্ত থাকে এবং ইহাই সর্ববিধ সৌভাগ্যের মূল। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত ইবনে ওমরকে (র) বলেন–"সকালে শয্যা হইতে উঠিয়া ভাবিও না যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে। আবার সন্ধ্যার সময় মনে করিও না যে, সকাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে। ইহকালেই পরকালের সম্বল সংগ্রহ করিয়া লও; সুস্থ অবস্থায়ই পীড়ার সম্বল হস্তগত কর। কারণ, আগামীকল্য আল্লাহ্‌র নিকট তোমার কি নাম (অর্থাৎ জীবিত কি মৃত, পীড়িত কি সুস্থ) হইবে তাহা তুমি জান না।" তিনি অন্যত্র বলেন–"তোমাদের সম্বন্ধে দুইটি স্বভাব হইতে আমি যত ভয় পাই তত ভয় অন্য কিছু হইতে পাই না। প্রথম, প্রবৃত্তির অনুসরণ করা; দ্বিতীয়, দীর্ঘ জীবনের আশা করা।"

হযরত ওসামা (রা) একমাস চলিবার উপযোগী কোন দ্রব্য কিনিয়া লইলেন। ইহাতে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন –"ওসামা দীর্ঘ জীবনের আশা করেন; সুতরাং তাহার পক্ষে এক মাসের দ্রব্য সংগ্রহ করা বিচিত্র নহে। যে আল্লাহ্‌র হাতে আমার প্রাণ, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি যখন চক্ষু মুদ্রিত করি তখন মনে করি চক্ষু খুলিবার পূর্বেই আমার মৃত্যু ঘটিবে এবং চক্ষু খুলিলে মনে করি চক্ষু মুদ্রিত করিবার পূর্বেই মরিয়া যাইব। আর মুখে এক লোকমা অন্ন স্থাপন করিবার সময় মনে হয় ইতিমধ্যেই মৃত্যু আসিয়া পড়িবে। ফলে মুখের অন্ন গলার নিচে নামিতে পারিবে না।" ইহা বলিবার পর তিনি বলিলেন–"হে লোকগণ, তোমরা বুদ্ধিমান হইলে নিজকে মৃত বলিয়া মনে কর। কারণ, যে আল্লাহ্‌র হাতে আমার জীবন, তিনি তোমাদের সম্বন্ধে যে-ওয়াদা করিয়াছেন তাহা আসিবে এবং তাহা হইতে তোমরা পলাইতে পারিবে না।" পায়খানা প্রস্রাবের পর রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তৎক্ষণাৎ তাইয়াম্মুম করিয়া লইতেন। সাহাবাগণ (র) আরয করিতেন–"হে আল্লাহর রাসূল (সা), পানি নিকটেই আছে।" কিন্তু তিনি উত্তর দিতেন–"পানি পাইবার পূর্বেই হয়ত মরিয়া যাইব।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন– "রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি চতুর্ভুজ অঙ্কন করিলেন; ইহার মধ্যস্থলে একটি সরল রেখা টানিলেন। সেই সরল রেখার উভয় পার্শ্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাপাত করিলেন এবং সেই চতুর্ভুজের বাহিরে আর একটি রেখা টানিয়া

বলিলেন–"চতুর্ভুজের মধ্যস্থিত সরলরেখাকে মানুষ বলিয়া মনে কর। চতুর্ভুজের ঘেরকে তাহার মৃত্যু বলিয়া ধরিয়া লও; ইহা হইতে সে বাহিরে পলায়ন করিতে পারে না। অভ্যন্তরস্থ সরল রেখার উভয় পার্শ্বে অঙ্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাসমূহ মানবের বিপদাপদ। সে এক বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেও অপর বিপদে নিপতিত হইবে। মৃত্যু পর্যন্ত এইরূপই ঘটিবে। চতুর্ভুজের বাহিরের রেখা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা। মানুষ এমন কাজের খেয়ালেই সর্বদা থাকে যাহা আল্লাহ্ জানেন যে, তাহার মৃত্যুর পূর্বে সমাপ্ত হইবে না।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"মানুষ ক্রমশ বৃদ্ধ হইতে থাকে। কিন্তু তাহার মধ্যে দুই বস্তু ক্রমশ যৌবনের দিকে ধাবিত হইতে থাকে– (১) ধনলোভ ও (২) বাঁচিবার আশা।"

হাদীস শরীফে আছে, হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম এক বৃদ্ধকে কোদালী হস্তে ভূমি খনন করিতে দেখিয়া আল্লাহ্‌র নিকট বৃদ্ধের হৃদয় হইতে আশা বাহির করিয়া দিবার প্রার্থনা জানাইলেন। আল্লাহ তাহার হৃদয় হইতে আশা বিদূরিত করিলেন। বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ কোদালটি এক পার্শ্বে রাখিয়া শয়ন করিল। কিছুক্ষণ পর হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম পুনরায় দু'আ করিলেন–"হে আল্লাহ্, বৃদ্ধের মনে আশা দাও।" বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া নিজ কাজে লাগিয়া গেল। হযরত ঈসা (আ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"তোমার কি হইয়াছিল?" বৃদ্ধ বলিল–"হঠাৎ আমার মনে জাগিল–পরিশ্রম করিতে করিতে বৃদ্ধ হইলাম, আর কত পরিশ্রম করিব? শীঘ্রই মরিয়া যাইব। তাই কোদালী রাখিয়া দিয়াছিলাম। আবার মনে জাগিল–যখন মরণ আসিবে তখন ত মরিবই। কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া থাকি ততদিন ত আহার করিতেই হইবে। ইহা মনে হওয়াতে উঠিয়া নিজ কাজে প্রবৃত্ত হইলাম।"

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"তোমরা কি বেহেশতে যাইতে চাও?" তাঁহারা নিবেদন করিলেন–"হাঁ চাই।" তখন তিনি বলিলেন–"আশা কম কর, মৃত্যুকে সর্বদা চক্ষুর সম্মুখে রাখ এবং আল্লাহকে যেরূপ শরম করা দরকার তাঁহাকে তদ্রূপ শরম কর।" এক বুযুর্গ তাঁহার ভাইকে পত্র লিখিলেন–"অতঃপর অবগত হও, দুনিয়া স্বপ্ন এবং পরকাল চৈতন্যের জগত। এই উভয়ের মধ্যে মৃত্যু অবস্থিত। আমরা যেই জগতে আছি তাহা বিশৃঙ্খল খেয়াল মাত্র।"

দীর্ঘ জীবনাশার কারণ–দুইটি কারণে মানুষ দীর্ঘ জীবনের আশা করে: যথা– (১) দুনিয়ার মহব্বত ও (২) অজ্ঞানতা।

দুনিয়ার মহব্বত– দুনিয়ার মহব্বত হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠলে হঠাৎ মৃত্যু আসিয়া দুনিয়াকে মানব হইতে কাড়িয়া লইয়া যায়। এইজন্য লোকে মৃত্যুকে ভালবাসে না। আবার, মৃত্যু মানব-প্রকৃতির বিপরীত। যাহা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ তাহাকে লোকে নিজ হইতে দূরে সরাইয়া রাখে এবং যাহা প্রকৃতি চায় তাহা গ্রহণ করিতে সর্বদা হৃদয়কে ফুসলাইতে থাকে; আর হৃদয়েও তাহার ছবি অঙ্কিত হইতে থাকে। এইজন্য লোকে জীবন, ধন-সম্পত্তি, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও দুনিয়ার যাবতীয় আসবাবপত্রকে স্থায়ী বলিয়া মানিয়া লয় এবং তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ মৃত্যুকে সে ভুলিয়া থাকে। কোন সময় মৃত্যু-চিন্তা হৃদয়ে উদিত হইলেও প্রবৃত্তি তাহা ভুলাইয়া দেয় এবং সে বলিতে থাকে–"হে, এখনও বহু সময় বাকী আছে। ইতিমধ্যে মৃত্যুর সম্বল সংগ্রহ করিয়া লইব।" বয়স অধিক হইলে বলিতে থাকে–"এখনই কি হইল? প্রতীক্ষা কর, বার্ধক্য আসিতে না আসিতেই সব ঠিক করিয়া লইব।" বৃদ্ধ হইলে বলিতে থাকে–"একটু থাম, এই ইমারত আরম্ভ করা হইয়াছে, শেষ করিয়া লই, এই পুত্রের জন্য একটি জাহাজ বানাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া লই; এই ক্ষেত্রে পানি সেচনের একটি বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া লই। হাতের এই কাজগুলি শেষ হইলে মনের টান আর কোন দিকে থাকিবে না এবং ইবাদতেও স্বাদ পাইব। আবার দেখ, অমুক ব্যক্তি আমার অনিষ্ট করিয়াছে; তাহাকে শায়েস্তা করিয়া লই।" এইরূপ সে দুনিয়ার সমস্ত কাজ সমাপ্ত করত নিশ্চিন্ত হইবার জন্য পরকারের কাজে বিলম্ব করে। কিন্তু দুনিয়ার কাজগুলি পরস্পর জড়িত রহিয়াছে এক কাজে হাত দিলে আর দশটা সেই সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই নির্বোধ ইহাও জানে না যে, সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া দুনিয়া হইতে অবসর লওয়া অসম্ভব কথা। তবে হাতের কাজ অসম্পূর্ণই থাকুক না কেন, ইচ্ছাপূর্বক দুনিয়া বর্জন করিলে অবসর হওয়া যায়। কিন্তু সেই নির্বোধ মনে করে, দুনিয়ার সকল কাজ সমাপ্ত করিয়াই অবসর গ্রহণ করিবে। এইরূপে সে আখিরাতের কাজে বিলম্ব করিতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ একদিন অলক্ষ্যে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন বৃথা অনুতাপ অনুশোচনায় তাহার মন দগ্ধ হইতে থাকে। এইজন্যেই দোযখবাসিগণ ক্ষোভ ও অনুশোচনায় চিৎকার সহকারে ফরিয়াদ করিতে থাকিবে। দুনিয়ার মহব্বতই এই সকলের মূল এবং এই কারণেই মানুষের মধ্যে পরকালের প্রতি অসতর্কতা জন্মে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যে বস্তুকে তুমি ভালবাসিতে ইচ্ছা কর ভালবাস। কিন্তু অবশেষে তাহা তোমা হইতে কাড়িয়া লওয়া হইবে।"

অজ্ঞানতা–অজ্ঞানতা এই যে, লোকে দীর্ঘ জীবনের উপর ভরসা করিয়া থাকে এবং বুঝে না যে, বহু লোক বৃদ্ধ হইবার পূর্বেই মরিয়া যায়। হাজার হাজার যুবক ও বালক মরিয়া যাইতেছে। কম লোকই বৃদ্ধ হইয়া মরে। এইজন্যই বৃদ্ধ লোক কম পাওয়া যায়। অপর অজ্ঞানতা এই যে, লোকে সুস্থাবস্থায় হঠাৎ মৃত্যু অসম্ভব মনে করে। তাহারা বুঝে না যে, হঠাৎ মৃত্যু অসম্ভব হইলেও হঠাৎ পীড়িত হওয়া অসম্ভব নহে। সকল পীড়াই হঠাৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং পীড়িত ব্যক্তির মৃত্যু অসম্ভব নহে। ধ্রুব বিশ্বাস করিয়া লও যে, মৃত্যু আমাদের সম্মুখে সূর্যসদৃশ। ইহার কিরণ আমাদের উপর পতিত আছে। মনে করিও না যে, ছায়ার ন্যায় মৃত্যু আমাদের অগ্রে অগ্রে যাইতেছে এবং ছায়াকে যেমন আমরা ধরিতে পারি না মৃত্যুকেও তদ্রূপ ধরিতে পারিব না।

দীর্ঘ জীবনাশার প্রতিকার– যে-কারণে পীড়া জন্মে, তাহা বিনাশ করিলে পীড়া বিদূরিত হয়। দীর্ঘ জীবনাশার কারণ যখন তুমি জানিয়াছ তখন সেই কারণ বিনাশে সচেষ্ট হও। দুনিয়ার মহব্বত দীর্ঘ জীবনাশার কারণ। ইহা বিদূরণের ব্যবস্থা বিনাশন খণ্ডে ইতঃপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তদনুযায়ী আমল করিতে হইবে। মোটকথা এই, যে ব্যক্তি দুনিয়ার সম্যক পরিচয় পাইয়াছে, সে কখনও দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয় না। কারণ, দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ সামান্য কয়েক দিনের জন্য মাত্র। মৃত্যু আসিলে উহা আপনা-আপনিই লোপ পায়। আবার দুনিয়াও নানাবিধ পঙ্কিলতায় পরিপূর্ণ এবং দুঃখকষ্টের দুনিয়াতে কাহারও অদৃষ্টে অবিমিশ্র সুখ মিলে না। যে-ব্যক্তি পরকালের দীর্ঘতা এবং দুনিয়ার জীবনের অল্পতা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছে, সে বুঝিতে পারিবে যে, পরকালের বিনিময়ে দুনিয়া গ্রহণ করা জাগ্রত অবস্থায় স্বর্ণমুদ্র পাওয়া অপেক্ষা স্বপ্নে এক কপর্দক পাওয়াকে অধিক পছন্দ করার ন্যায়। কারণ, দুনিয়া স্বপ্নসদৃশ। 'মানব নিদ্রিত আছে, মরিলেই জাগিয়া উঠিবে।'

প্রকৃত মা'রিফাত ও যথার্থ চিন্তা দ্বারা অজ্ঞানতা বিদূরিত হয়। মানুষের বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক, মৃত্যু তাহার ক্ষমতাধীন নহে যে, সে যে-সময়ে ইচ্ছা করে, সেই সময়ে মৃত্যু আসিবে। এইজন্যই সে দীর্ঘ জীবনের আশায় দুনিয়ার

সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন করত পরকালের কাজে মনোনিবেশ করিবার ভরসায় থাকিতে পারে না।

দীর্ঘ জীবনাশার শ্রেণী-বিভাগ – দীর্ঘ জীবন যাহারা আশা করে, তাহাদের সকলেই এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহে। কেহ চিরকাল দুনিয়াতে থাকিতে ইচ্ছা করে। ইহার প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ اَلْفَ سَنَةٍ –

অর্থাৎ "তাহাদের কেহ কেহ হাজার বৎসর বাঁচিবার আশা করে।" কেহ কেহ আবার বৃদ্ধ হইবার আশা রাখে, কেহ কেহ এক বৎসরের অধিক বাঁচিবার আশা করে না। সুতরাং তাহারা আগামী বৎসরের জন্য কোন আয়োজন-উদ্‌যোগও করে না। আবার কেহ কেহ এক দিনের অধিক জীবনাশা করে না। তাহারা আগামীকল্যের জন্যও কোন আয়োজন করে না। যেমন হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম বলেন– "আগামীকল্যের জন্য জীবিকা জমা করিও না। কারণ, পরমায়ু অবশিষ্ট থাকিলে জীবিকাও পাইবে। আর কল্য পর্যন্ত জীবন না থাকিলে অপরের যিন্দেগীর জন্য কেন তুমি কষ্ট ভোগ করিবে?" কেহ কেহ আবার একটি নিশ্বাস ফেলিবার সময় পর্যন্তও বাঁচিবার আশা করে না। যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পানি নিকটবর্তী থাকা সত্ত্বেও ইহা হস্তগত হইবার পূর্বেই মৃত্যু আসিতে পারে, এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি তাইয়াম্মুম করিয়া লইতেন। আবার কেহ কেহ এমনও আছেন যে, মৃত্যু সর্বদাই তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে থাকে, কখনও অদৃশ্য হয় না। যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত মু'আযকে (রা) ঈমানের হাকীকত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন–"কোন বস্তু হস্তগত হইলে আমার আশঙ্কা হয়, মৃত্যু তখনই আমার হাত হইতে ইহা ছিনাইয়া লইবে।" হযরত আস্‌ওয়াদ হাব্‌শী (র) নামাযে দণ্ডায়মান হইবার সময় চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল– "আপনি কি দেখেন?" তিনি বলিলেন–"মৃত্যু কোন্ পথে আসিতেছে তাহাই দেখিতেছি।"

মোটকথা, দীর্ঘ বা হ্রস্ব জীবনাশা সম্বন্ধে মানুষের শ্রেণী-বিভাগ আছে। যেই ব্যক্তি এক মাসের অধিক বাঁচিবার আশা রাখে না, সেই ব্যক্তি চল্লিশ দিন বাঁচিবার আশাধারী ব্যক্তি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই উভয় শ্রেণীর কাজ ও ব্যবহারে তদ্রূপ দীর্ঘাশার প্রভাব সুস্পষ্ট দেখা যায়। কারণ, যে-ব্যক্তির দুই ভাই বিদেশে

আছে, তন্মধ্যে একজন এক মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে বলিয়া জানা গিয়াছে এবং অপর ভাই এক বৎসর পরে আসিবে এমন স্থলে যে-ভাই এক মাসের মধ্যে আসিবে সে তাহার অভ্যর্থনার জন্য আয়োজন-উদ্‌যোগ অগ্রে করে এবং যে ভাই বৎসরান্তে আসিবে তাহার আয়োজনে বিলম্ব করিয়া থাকে।

যাহা হউক, প্রত্যেকেই নিজকে স্বল্প আশাধারী বলিয়া মনে করে। কিন্তু যে-ব্যক্তি শীঘ্র শ্রীঘ্র সৎকর্ম সম্পাদনে তৎপর থাকে এবং আর একটি মুহূর্ত জীবিত থাকিলেও মহা সুযোগ মনে করিয়া ইহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে, তাহাকেই জীবনে স্বল্প আশাধারী বলা যাইতে পারে। যেমন রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"পাঁচ বস্তুকে অপর পাঁচটির পূর্বে মহা সুযোগ মনে কর– (১) বার্ধক্য আসিবার পূর্বে যৌবনকে, (২) রোগ আসিবার পূর্বে স্বাস্থ্যকে, (৩) অভাব আসিবার পূর্বে সঙ্গতিকে, (৪) কর্ম-ব্যাপৃতির পূর্বে অবসর কালকে এবং (৫) মৃত্যু আসিবার পূর্বে জীবনকে।" তিনি অন্যত্র বলেন–"দুইটি নি'আমত এমন যে, অধিকাংশ লোক উহাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; (উহারা হইতেছে) স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছলতা।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণের মধ্যে গাফলতের কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলে তিনি তাঁহাদের মধ্যে উচ্চৈস্বরে বলিতেন–"মৃত্যু আসিতেছে; ইহা কাহারও জন্য সৌভাগ্য আনিতেছে, কাহারও জন্য দুর্ভাগ্য।"

হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন যে, প্রত্যহ প্রাতে 'প্রস্থান, প্রস্থান' বলিয়া আকাশবাণী হয়। হযরত দাউদ তাঈকে (রা) নামাযের দিকে দৌড়িয়া যাইতে দেখিয়া লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন–"নগর-দ্বারে সৈন্যগণ আমার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।" অর্থাৎ কবরস্থানে মৃত ব্যক্তিগণ আমাকে না লইয়া ফিরিবে না। হযরত আবূ মূসা আশ্‌'আরী (রা) বৃদ্ধ বয়সে অত্যন্ত পরিশ্রম ও কঠোর রিয়াযত করিতেন। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল–"এত কঠিন পরিশ্রম না করিলে কি নয়?" তিনি বলিলেন–"দৌড়ের মাঠে ঘোড়াগুলি দৌড় আরম্ভ করিলে মাঠের শেষভাগে গিয়া দেহের সমস্ত বল-প্রয়োগে প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হয়। এখন আমার জীবন-দৌড়ের শেষ ভাগ। মৃত্যু নিকটবর্তী হইয়াছে। তাই আপ্রাণ শক্তি প্রয়োগে পরিশ্রম ও রিয়াযত করিয়া লই।"

প্রাণবায়ু বহির্গমন ও মৃত্যু-যন্ত্রণা– মৃত্যুকালে অন্য কোন পারলৌকিক বিপদাপদের সম্মুখীন না হইয়া শুধু যদি প্রাণবায়ু বহির্গমনের যন্ত্রণা পাইতে

হইত তবেও সেই যন্ত্রণার ভয়ে দুনিয়ার সকল আনন্দ পরিত্যাগ করা মানুষের উচিত ছিল। যদি এই ভয় থাকে যে, কোন দুর্ধর্ষ সিপাহী গৃহে প্রবেশ করিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা তাহাকে আঘাত করিবে তবে সেই ব্যক্তি কখনই আহার-নিদ্রায় আনন্দ পাইবে না। অথচ সিপাহীর আগমন নিশ্চিত নহে এবং মৃত্যুর আগমন ও প্রাণবায়ু বাহির করিয়া লওয়া ধ্রুব সত্য। আবার সিপাহীর দণ্ডাঘাত অপেক্ষা মৃত্যুকষ্ট ভীষণতর যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু মোহভ্রমে পতিত আছে বলিয়া মানুষ সেই ভয়ে ভীত নহে। সকল বুযুর্গ এক বাক্যে বলিয়াছেন প্রাণবায়ু বাহির করিবার সময় যে-কষ্ট হয়, তাহা তলোয়ারের আঘাতে ঠুকরা টুকরা হওয়ার কষ্ট অপেক্ষা কঠিনতর। আঘাতে কষ্ট হওয়ার কারণ এই যে, আঘাতের ব্যথা আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের জীবনীশক্তি পর্যন্ত পৌঁছে এবং আঘাতের স্থানে তলোয়ার জীবনীশক্তিকে কি পরিমাণে স্পর্শ করে, ইহা কাহারও অবিদিত নহে। অগ্নি দ্বারা দেহের কোন অংশ দগ্ধ হইলে ইহার সন্তাপ সমস্ত দেহে সঞ্চারিত হয়। এইজন্যই তলোয়ারের আঘাত অপেক্ষা অগ্নি দ্বারা দহনে অধিক কষ্ট হয়। জীবনীশক্তি বা প্রাণ দেহের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মৃত্যুকালে এই প্রাণ ছিন্ন করিয়া বাহির করিতে গেলে দেহের সর্বত্র ইহার বেদনা অনুভূত হয়। ইহার প্রভাবে সর্ব শরীর অবশ হইয়া পড়ে এবং বাকযন্ত্রও চলিতে পারে না– নীরব হইয়া যায়; আর বুদ্ধিও তখন ঠিক থাকে না। যাহারা মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে কেবল তাহারাই ইহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারে। কিন্তু নবীগণ নবুওতের আলোকে ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন।

মৃত্যু-যন্ত্রণা সম্বন্ধে হাদীস ও বুযুর্গগণের উক্তি –হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম বলেন –"হে বন্ধুগণ, আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ কর যেন তিনি আমার উপর মৃত্যু-যন্ত্রণা সহজ করেন। মৃত্যু-যন্ত্রণা কেমন কঠিন বুঝিতে পারিয়া সেই ভয় আমি জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছি।" ইন্তিকালের সময় রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই দু'আ করিতেছিলেন–

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ –

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্, মুহাম্মদের (সা) উপর মৃত্যু-যন্ত্রণা সহজ কর।" হযরত আয়েশা (রা) বলেন–"যাহার উপর মৃত্যু-যন্ত্রণা সহজ হয়, তাহার (সৌভাগ্যের) কোন আশা আমি করি না। কারণ, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পবিত্র দেহ হইতে জীবন বহির্গত হইবার সময়ের মৃত্যু–যন্ত্রণা আমি

স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেই সময় তিনি বলিতেছিলেন–"হে আল্লাহ্, অস্থি ও শিরাসমূহের ভিতর হইতে তুমি রূহ টানিয়া বাহির করিতেছ–এই যন্ত্রণা আমার উপর সহজ কর।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুযন্ত্রণা ও কষ্টের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন– "তলোয়ার দ্বারা তিন শত আঘাত করিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয়, মৃত্যু-যন্ত্রণা তদ্রূপ।" তিনি অন্যত্র বলেন–"যে মৃত্যু সর্বাপেক্ষা সহজ হয় তাহাও লৌহ কন্টকের যন্ত্রণার ন্যায় যাহা পদে বিদ্ধ হইলে বাহির করাই সম্ভবপর নহে।"

এক রোগী মৃত্যু-শয্যায় যাতনা পাইতেছিল। রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহার নিকট যাইয়া বলিতে লাগিলেন–"তাহার যন্ত্রণা সম্বন্ধে আমি অবগত আছি। তাহার শরীরে এমন কোন শিরা-উপশিরা নাই যাহাতে পৃথক পৃথকভাবে যাতনা অনুভূত হইতেছে না।" হযরত আলী রাযিয়াল্লাহ আনহু বলেন–"হে মুসলমানগণ, কাফিরদের সহিত ধর্মযুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হও। কারণ, বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া মৃত্যু-যাতনা সহ্য করা অপেক্ষা হাজার হাজার তলোয়ারের আঘাতজনিত মৃত্যুকে আমি অধিক সহজ মনে করি।" বানী ইসরাঈলের কতক লোক এক কবরস্থানের পার্শ্ব দিয়া গমনকালে দু'আ করিল–"হে আল্লাহ, এই মৃতদের একজনকে জীবিত করিয়া তোল।" আল্লাহ একজনকে জীবিত করিলেন। সেই ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল–"হে লোকগণ, তোমরা আমার নিকট কি চাও? পঞ্চাশ বৎসর হইল আমার মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাবধি আমার শরীরে মৃত্যু-যন্ত্রণার কষ্ট অনুভূত হইতেছে।" এক সাহাবী (রা) বলেন– "মুসলমান স্বীয় আমল দ্বারা যে মরতবা লাভ করিতে পারে না, আল্লাহ্ তাহাকে মৃত্যু-যন্ত্রণা দিয়া সেই মরতবায় উন্নীত করেন। আর কাফির সৎকর্ম করিয়া থাকিলে আল্লাহ্ ইহার বিনিময়ে তাহার উপর মৃত্যু-যন্ত্রণা লঘু করিয়া দেন যাহাতে পরকালে তাহার কোন প্রাপ্য না থাকে।" হাদীস শরীফে আছে–"হঠাৎ মৃত্যু মুসলমানের পক্ষে আরাম এবং কাফিরের পক্ষে ক্ষোভ।" হাদীস শরীফে আছে : হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের মৃত্যুকালে আল্লাহ্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"মৃত্যু-যন্ত্রণা কিরূপ মনে করিতেছ?" তিনি নিবেদন করিলেন–"এমন পক্ষীর ন্যায় যাহাকে জীবিতাবস্থায় ভাজা করা হইতেছে: আর ইহা উড়িয়া যাইতে পারিতেছে না বা মরিয়া যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইতেছে না।" হযরত কা'বুল আহ্‌বার (রা) হযরত ওমরকে (রা) মৃত্যু-যন্ত্রণার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন–"কণ্টকযুক্ত

একটি শাখা উদরস্থ হইলে এবং এক একটি কাঁটা এক একটি রগে ফুটিয়া গেলে সেই শাখা টানিয়া বাহির করিবার সময় যেরূপ কষ্ট হয় মৃত্যুযন্ত্রণা তদ্রূপ।"

মৃত্যুকালীন বিভীষিকা–প্রাণ বাহির হওয়ার সময় যে-ভীষণ কষ্ট সহ্য করিতে হয় ইহা ব্যতীত আরও তিনটি ভীষণ বিভীষিকা মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে। **প্রথম বিভীষিকা**–মালাকুল মওত হযরত আযরাঈল আলায়হিস সালামের রূপ দর্শন। হাদীস শরীফে আছে, হযরত ইবরাহীম আলায়হিস সালাম মালাকুল মওতকে বলিলেন–"তুমি পাপীর প্রাণ হরণকালে যে-রূপ ধারণ কর আমি তোমার সেই রূপ দেখিতে চাই।" মালাকুল মওত বলিলেন–'আপনি সহ্য করিতে পারিবেন না।' হযরত ইবরাহীম (আ) বলিলেন–"তোমার সেই রূপ আমাকে অবশ্যই দেখাইতে হইবে।' মালাকুল মওত সেই রূপ ধারণ করিলেন। পাপীর প্রাণ হরণকালে তাঁহার রূপ কিরূপ ভয়াবহ হয়, তাহা প্রকাশ পাইল। সম্মুখেই এক কৃষ্ণবর্ণ ভীষণাকার এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান, মস্তকে মোটা মোটা রুক্ষ কেশ, পরিধানে কৃষ্ণবর্ণ পোশাক,; অগ্নিশিখা ও ধূয়া তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইতেছে। হযরত ইবরাহীম (আ) সেই ভীষণ রূপ দর্শনে বেহুশ হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন এবং মালাকুল মওত স্বীয় স্বাভাবিক রূপ ধারণ করিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন–'হে মালাকুর মওত (মৃত্যুর ফিরিশতা), পাপীকে তোমার ভীষণ রূপ প্রদর্শনই তাহার পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি।"

নেক্‌কারের মৃত্যুকালে মালাকুল মওতের মনোরম সূরত– নেক্‌কার লোক মালাকুল মওতকে তদ্রূপ ভীষণ আকারে দর্শন করে না; বরং তাঁহাকে মনোরম আকারে দর্শন করিয়া থাকে। নেক্‌কার লোকে যে-সকল আরাম ভোগ করিতে পায়, তাহা ছাড়িয়া দিলেও মালাকুল মওতের মনোরম সূরত দর্শনই তাহার পুণ্যের যথেষ্ট পুরস্কার। হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম মালাকুল মওতকে জিজ্ঞসা করিলেন–"তুমি লোকের প্রতি সমবিচার কর না কেন? একজনের প্রাণ শীঘ্র বাহির করিয়া লও, আবার অপরকে অস্থিরভাবে নাড়াচড়া করিয়া আস্তে আস্তে মারিয়া থাক।" হযরত আযরাঈল (আ) বলিলেন–"এই সম্বন্ধে আমার কোন স্বাধীন ক্ষমতা নাই। প্রত্যেক ব্যক্তির নামের তালিকা আমি পাইয়া থাকি। ইহাতে যেরূপে প্রাণ হরণের আদেশ লিপিবদ্ধ থাকে আমি তদনুযায়ী কাজ করিয়া থাকি।"

মালাকুল মওতের আগমন সম্বন্ধে বুযুর্গগণের উক্তি– হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বেহ (রা) বলেন –"একদা এক বাদশাহ অশ্বারোহণে বাহির হইতে চাহিলেন। তিনি পোশাক চাহিলে উহা উপস্থিত করা হইল। কিন্তু সেই পোশাক তাঁহার পছন্দ হইল না। পরিশেষে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করিলেন। তৎপর কতকগুলি উৎকৃষ্ট অশ্ব উপস্থিত করা হইল। উহাও তাঁহার পছন্দ হইল না। বাদশাহ্ অনন্তর সকল অশ্ব হইতে বাছিয়া লইয়া সর্বোৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ করিলেন। ইহার পর আড়ম্বরপূর্ণ সৈন্য-সামন্ত লইয়া বাদশাহ্ বহির্গত হইলেন। অহংকারে ফুলিয়া তিনি কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। এমন সময় মালাকুল মওত মলিন বস্ত্র পরিহিত দরিদ্র বেশে বাদশাহ্র সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সালাম বলিলেন। বাদশাহ্ সালামের জওয়াব পর্যন্ত দিলেন না। মালাকুল মওত বাদশাহ্র অশ্বের লাগাম ধরিয়া ফেলিলেন। বাদশাহ্ বলিলেন–"কত বড় বেআদবী! তাহাকে সরাইয়া দাও।" মালাকুল মওত বলিলেন–"মহারাজ, আপনার নিকট আমার কিছু বক্তব্য আছে।' বাদশাহ্ বলিলেন–'থাম, আমি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া লই।' মালাকুল মওত বলিলেন–না, আমি এখনই বলিব।' বাদশাহ্ বলিলেন-'তবে বল।' মালাকুল মওত তাঁহার কানে কানে বলিলেন–'আমি যমদূত। এই মুহূর্তেই তোমার প্রাণ বাহির করিয়া লইবার জন্য আমি আসিয়াছি।' ইহা শুনামাত্র তাহার বদনমণ্ডলের বর্ণ পরিবর্তিত হইল; মুখে কোন কথা সরিল না। অতি কষ্টে বাদশাহ বলিতে লাগিলেন–'গৃহে ফিরিয়া স্ত্রী-পুত্রদের নিকট হইতে বিদায় লওয়ার অবকাশ দিন।' মালাকুর মওত তাঁহাকে সময় দিতে অস্বীকার করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণ বাহির করিয়া লইলেন। বাদশাহ্ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গেলেন এবং মালাকুল মওত প্রস্থান করিলেন।"

মালাকুল মওত একজন মুসলমানকে দেখিয়া বলিলেন–"একটি গোপন কথা আপনাকে শুনাইতে চাই।" সেই ব্যক্তি বলিলেন–"কি কথা বলুন।" মালাকুল মওত বলিলেন–"আমি যমদূত।" সেই ব্যক্তি বলিলেন–"মারহাবা, বহুদিন যাবত আমি আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। আপনার শুভাগমন আমার অতি প্রিয়। এখন আমার প্রাণ বাহির করিয়া লউন।" মালাকুল মওত বলিলেন–"যে সকল প্রয়োজনীয় কাজ রহিয়াছে উহা আগে সমাধা করিয়া লউন।" সেই ব্যক্তি বলিলেন–"আল্লাহ্কে দর্শন করা অপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাজ আমার আর নাই।" মালাকুল মওত বলিলেন–"এখন আপনি যে-অবস্থায় ইচ্ছা

করেন সেই অবস্থায়ই আমি আপনার প্রাণ বাহির করিয়া লইব।" সেই ব্যক্তি বলিলেন–"তবে এতটুকু বিলম্ব করুন যাহাতে আমি ওযু করিয়া নামায আরম্ভ করিতে পারি। যখন আমি সিজদায় প্রণত হইব তখন আমার প্রাণ বাহির করিয়া লইবেন।" মালাকুল মওত তাহাই করিলেন।

হযরত ওহাব ইব্নে মুনাব্বেহ (রা) আরও বলেন–"এক দেশে এক মহা পরাক্রান্ত বাদশাহ্ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় পরাক্রমশালী বাদশাহ্ তখন ইহজগতে আর কেহই ছিলেন না। মালাকুল মওত তাঁহার রূহ কবয করিয়া আকাশে উপস্থিত হইলে ফিরিশতাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন–'হে মালাকুল মওত, প্রাণ হরণ করিবার সময় কখনও কি তোমার মনে কাহারও প্রতি দয়া জন্মিয়াছিল?' মালাকুল মওত বলিলেন –'হাঁ, এক বিজন অরণ্যে এক গর্ভবতী মহিলা অসহায় পতিত ছিল। এমন সময় তাহার এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ট হইল; ঠিক সেই সময় ঐ মহিলার প্রাণ হরণ করিবার জন্য আমার প্রতি আদেশ হইল। আমি তাহার প্রাণ বাহির করিয়া লইলাম। সেই অসহায় সদ্যপ্রসূত শিশুকে ধ্বংসের মুখে রাখিয়া আসিলাম। বিজন অরণ্যে সেই অসহায়া মহিলা ও নির্জনে ধ্বংসের মুখে পতিত সেই শিশু সন্তানের জন্য আমার মনে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল।' ফিরিশতাগণ বলিলেন–'তুমি ত সেই বাদশাহ্কে দেখিয়াছ যাহার ন্যায় পরাক্রমশালী নরপতি ধরাতলে আর কেহই ছিল না?' মালাকুর মওত বলিলেন–'হাঁ দেখিয়াছি।' ফিরিশতাগণ বলিতে লাগিলেন–'এই বাদশাহ্ সেই শিশু যাহাকে তুমি বিজন বনে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছিলে।' ইহা শুনিয়া মালাকুল মওত আল্লাহ্র প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করিলেন।

এক সাহাবী (রা) বলেন– "শাবানের ১৫ই রজনীতে মালাকুল মওত একটি তালিকাপ্রাপ্ত হন; সেই তালিকায় সেই বৎসরের মধ্যে যত লোক মরিবে তাহাদের নাম লিখিত থাকে। ঐ লোকদের কেহ তখন দুনিয়াতে দালান-কোঠা বানাইতে থাকে, কেহ বিবাহ-শাদী করিতে থাকে, কেহ বা ঝগড়া-বিবাদে প্রবৃত্ত থাকে; অথচ তাহাদের নাম সেই মৃত্যু তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে।" হযরত আমাশ (র) বলেন–"মালাকুল মওত হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের নিকট গিয়া তাঁহার জনৈক সঙ্গীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। মালাকুল মওত বাহির হইয়া গেলে সেই ব্যক্তি হযরত সুলায়মানকে (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন–'যে ব্যক্তি আমার প্রতি এমনভাবে দৃষ্টিপাত করিল সে কে?' হযরত

সুলায়মান (আ) বলিলেন–'মালাকুল মওত।' সেই ব্যক্তি বলিলেন–'মনে হয় মালাকুল মওত আমার প্রাণ বাহির করিয়া লইবে। আমাকে হিন্দুস্তানে লইয়া যাইবার জন্য আপনি বায়ুকে আদেশ করুন যেন, মালাকুল মওত পুনরায় এখানে আসিলে আমাকে না পায়।' হযরত সুলায়মান (আ) বায়ুকে আদেশ করিলেন। বায়ু তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ হিন্দুস্তানে পৌঁছাইয়া দিল। তৎপর মালাকুল মওত পুনরায় আসিলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন–'আপনি আমার অমুক সঙ্গীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন কেন?' মালাকুল মওত বলিলেন–'সেই সময় হিন্দুস্তানে সে ব্যক্তির প্রাণ বাহির করিবার জন্য আল্লাহ্‌র আদেশ হইয়াছিল; অথচ সে আপনার দরবারে ছিল। আমি চিন্তা করিলাম সেই দণ্ডে সে কিরূপে হিন্দুস্তানে উপস্থিত হইবে? আমি সেখানে যাইয়া তাহাকে তথায়ই পাইলাম। ইহাতে আমি বড় আশ্চর্যান্বিত হইলাম।"

সকলের সঙ্গেই মৃত্যুর সাক্ষাত ঘটিবে, এই কথা যেন বুঝিতে পার, এইজন্যই উপরের ঘটনাগুলি বর্ণিত হইল।

দ্বিতীয় বিভীষিকা–পাপ-পুণ্য লেখক ফিরিশতাদ্বয়কে দর্শন। হাদীস শরীফে আছে, মৃত্যুর সময় এই দুই ফিরিশতা মানুষের দৃষ্টগোচর হয়। নেককার ব্যক্তিকে ফিরিশতা বলেন– "আল্লাহ্ তোমাকে মঙ্গল দিয়া পুরস্কৃত করুন। আমাদের সম্মুখে তুমি সৎকাজ করিয়া আমাদিগকে খুব আরাম দিয়াছ।" কিন্তু বদকার লোককে ফিরিশতাদ্বয় বলেন–"আল্লাহ্ তোমাকে মঙ্গল দিয়া পুরস্কৃত না করুন। তুমি আমাদের সম্মুখে বহু মন্দ ও পাপ কাজ করিয়াছ।" ইহা শুনিয়া তাহার চক্ষু এমনভাবে ঊর্ধ্বদিকে খুলিয়া যাইবে যে, আর বন্ধ হইবে না।

তৃতীয় বিভীষিকা–মৃত্যুকালে লোকে বেহেশতে বা দোযখে তাহার বাসস্থান দেখিতে পায়। কারণ, তখন মালাকুল মওত নেককার লোককে বলেন–"হে আল্লাহ্‌র বন্ধু, তুমি বেহেশতে প্রবেশের সুসংবাদ গ্রহণ কর।" এবং পাপীকে বলেন–"হে আল্লাহ্‌র শত্রু, তোমাকে দোযখে প্রবেশের খবর দিতেছি।"

যাহাই হউক, উক্ত তিন প্রকার বিভীষিকা দর্শনে যে কষ্ট হয় ,তাহা মৃত্যু-যন্ত্রণার সহিত মিলিত হইয়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا – "হে আল্লাহ্, এই সকল যন্ত্রণা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।" ইহকালে মানুষ যত বড় কঠিন বিভীষিকাই দেখুক না কেন, উহা কবর ও তৎপরের বিভীষিকা হইতে নিতান্ত তুচ্ছ।

মৃতের সহিত কবরে কথাবার্তা – রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম বলেন– "মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখামাত্র কবর বলিবে, –'হে আদম সন্তান, তুমি কি জন্য আমার কথা ভুলিয়া ছিলে? তুমি কি জান না যে, আমি দুঃখ-কষ্ট, অন্ধকার, নির্জনতা ও কীটের গৃহ? একথা তুমি কিরূপে ভুলিয়াছিলে? আমার পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় কেন এত হতভম্ব হইয়া এক পদ আগে আবার এক পদ পাছে হটিয়াছিলে?' মৃত ব্যক্তি নেককার হইলে তাহার পক্ষ হইতে একজনে উত্তর দিবে–'হে কবর, তুমি কি বলিতেছ? এই ব্যক্তি নেককার ছিল; সে সৎকাজে আদেশ করিয়াছে এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করিয়াছে।' তখন কবর বলিবে–'তবে আমি তাহার নিকট উদ্যানে পরিণত হইতেছি।' তৎপর মৃত্যু ব্যক্তির দেহ অতি উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিবে এবং তাহার আত্মা আকাশে চলিয়া যাইবে।" অপর এক হাদীসে আছে, মৃতু ব্যক্তিকে কবরে রাখামাত্র তাহার উপর শাস্তি আরম্ভ হয়। পার্শ্ববর্তী কবরস্থ মৃত ব্যক্তি তাহাকে উচ্চৈস্বরে বলিতে থাকে–"হে পশ্চাতে আগমনকারী, তোমাকে (দুনিয়াতে) জীবিত রাখিয়া তোমার পূর্বেই আমরা চলিয়া আসিয়াছিলাম। আমাদিগকে মরিতে দেখিয়া তুমি উপদেশ গ্রহণ করিলে না কেন? তুমি কি দেখ নাই যে, আমরা এই জগতে চলিয়া আসিয়াছি এবং আমাদের কাজ করিবার সুযোগ ও ক্ষমতা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে? (আমাদের পর) তুমি (সৎকর্ম করিবার) অবকাশ পাইয়াছিলে। যে-সকল সৎকাজ আমাদের হাত হইতে ছুটিয়া গিয়াছিল উহা তুমি করিলে না কেন?' এইরূপে ভূতলের সকল কোণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলে–"হে বাহ্য দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ব্যক্তি, যাহারা তোমার ন্যায় দুনিয়ার প্রতি প্রণয়াসক্ত ছিল এবং তোমার পূর্বে মরিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিয়া তুমি উপদেশ গ্রহণ কর নাই কেন।"

হাদীস শরীফে আছে, নেককার বান্দাকে কবরে রাখামাত্র তাঁহার সৎকর্ম তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া লয় এবং তাঁহাকে আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখে। আযাবের ফিরিশতা বামদিক হইতে আসিতে থাকিলে নামায আসিয়া দণ্ডায়মান হয় এবং বলে–"বিরত হও, এই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য নামাযে দণ্ডায়মান থাকিত।" শিয়রের দিক হইতে আসিতে থাকিলে রোযা বলে–"ক্ষান্ত হও, এই ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র জন্য প্রচণ্ড ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিয়াছে।" শরীরের পার্শ্ব হইতে আসিতে থাকিলে হজ্জ ও জিহাদ বলে –"সরিয়া যাও, এই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় সর্বাঙ্গে পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করিয়াছে।" হস্তের দিক হইতে আসিতে

থাকিলে সদকা বলে–"হে ফিরিশতাগণ, বিরত হও, এই ব্যক্তি এই হস্তে আল্লাহর পথে বহু দান করিয়াছে।" তৎপর আযাবের ফিরিশতাগণ মৃত ব্যক্তিকে বলিতে থাকে–"তুমি সুখে থাক, তোমার মঙ্গল হউক।" অবশেষে রহমতের ফিরিশতা আসিয়া তাঁহার জন্য কবরে বেহেশতী ফরাশ বিছাইয়া দেয়, কবরকে দৃষ্টি-সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করিয়া দেয় এবং বেহেশতের এক প্রদীপ আনয়নপূর্বক লটকাইয়া দিয়া থাকে, যেন, সেই মৃত ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত সেই আলোকে থাকিতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে উবায়দ (রা) বলিয়াছেন–"রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–'মৃত ব্যক্তিকে কবরে স্থাপন করিলে যাহারা তাহাকে কবরস্থ করিবার জন্য আগমন করিয়াছে তাহাদের পদধ্বনি সে শুনিতে পায়; কিন্তু কবর ব্যতীত কেহই তাহার সহিত কথা বলে না। কবর তাহাকে বলে–'লোকে কি বার বার তোমার নিকট আমার বিভীষিকা ও বিপদের কথা বর্ণনা করে নাই? তুমি আমার নিকট আসিবার কি আয়োজন করিয়াছ ?"

মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন –রাসূলে মাকবূল সাল্লল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লাম বলেন – "মানুষ মরিয়া গেলে দুই ফিরিশতা তাহার নিকট আগমন করে। তাহাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণ, চক্ষু নীল বর্ণ; একজনের নাম মুনকার, অপরজনের নাম নাকীর। তাহারা মৃত ব্যক্তিকে পয়গম্বর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। মৃত ব্যক্তি মুসলমান হইলে বলে–'পয়গম্বর আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ এক এবং (হযরত) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার বান্দা ও রাসূল। তৎপর তাহার কবরকে সত্তর গজ চওড়া, সত্তর গজ লম্বা করত আলোকমালায় প্রদীপ্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং ফিরিশতা তাহাকে বলে–বিবাহ বাসরের ন্যায় এখন সুখে নিদ্রা যাও। তুমি যাহাকে ভালবাস, সেই ব্যতীত অপর কেহই তোমাকে জাগাইবে না।" আর মৃত ব্যক্তি মুনাফিক হইলে সে ফিরিশতাদ্বয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলিবে–'আমি ত কিছুই জানি না। লোকদিগকে কিছু বলিতে শুনিতাম এবং আমিও তাহাই বলিতাম।' তখন মাটিকে উভয় পার্শ্ব হইতে আসিয়া মিলিয়া যাইতে আদশে দেওয়া হইব। মৃত ব্যক্তিকে চাপিয়া ধরিয়া উভয় পার্শ্বের মাটি মিলিয়া যাইবে, এমন কি তাহার অস্থি-পঞ্জর পরস্পর মিলিত হইবে। কিয়ামত পর্যন্ত সে এইরূপ আযাবে নিপতিত থাকিবে।

রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হিস ওয়া সাল্লাম হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে জিজ্ঞাসা করিলেন– "হে ওমর, যখন তুমি মরিবে, তোমার আপন লোকে তোমার জন্য চারি গজ লম্বা ও সোয়া গজ চওড়া কবর খনন করিবে, তৎপর তোমাকে গোসল দিয়া কাফন পরাইয়া উক্ত করবে স্থাপন করিবে এবং তোমাকে কবরে প্রোথিত করিয়া (স্ব স্ব গৃহে) ফিরিয়া আসিবে, আর কবরে প্রশ্নকালী ফিরিশতা মুনকার ও নাকীর আসিয়া উপস্থিত হইবে; তাহাদের শব্দ বজ্রধ্বনির ন্যায় (ভয়ঙ্কর), চক্ষু বিদ্যুতের ন্যায় (ভীষণ), কেশ পদ পর্যন্ত লম্বিত, তাহাদের দাঁত দ্বারা কবরের মাটি এলোমেলো করিতে থাকিবে, তখন তোমার অবস্থা কেমন হইবে? হযরত ওমর (র) নিবেদন করিলেন–"হে আল্লাহ্‌র রাসূল, তখন কি আমার বুদ্ধি ঠিক থাকিবে?" তিনি বলিলেন–"হাঁ ঠিক থাকিবে।" হযরত ওমর (র) নিবেদন করিলেন–"তাহা হইলে আমার কোন ভয় নাই; আমি তাহাদের প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিয়া দিব।"

কবরের শাস্তি– হাদীস শরীফে আছে–"কবরে কাফিরের প্রতি শাস্তি প্রদানের জন্য দুইজন অন্ধ ও বধির ফিরিশতা নিযুক্ত হইবে। উভয়ের হস্তে লৌহ মুদ্গর থাকিবে। ইহার অগ্রভাগ উটের পান-পাত্র ডোলের ন্যায় হইবে। ফিরিশ্‌তাদ্বয় (এই লৌহ-মুদ্গর দ্বারা) তাহাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবিরাম প্রহার করিতে থাকিবে। তাহাদের চক্ষু নাই যে, তাহার দুরবস্থা দেখিয়া দয়া করিবে। আবার কান নাই যে, তাহার ক্রন্দনধ্বনি ও অনুনয় বিনয় শুনিবে।" হযরত আশেয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন যে, রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"কবর প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকে চাপিয়া ধরে। কেহ এই চাপ হইতে বাঁচিলে সা'দ ইবনে মু'আয বাঁচিত।"

হযরত আনাস (রা) বলেন– "হযরত যয়নব রাযিয়াল্লাহু আনহা রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কন্যা ছিলেন। তিনি ইন্তিকাল করিলে হযরত (সা) তাঁহাকে করবে রাখিলেন। কিন্তু তখন হযরতের (সা) বদনমণ্ডল নিতান্ত পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। কিন্তু (কবর হইতে) বাহিরে আসিবার কালে তাঁহার বদনমণ্ডল পূর্বের ন্যায় নূরানী হইল। আমরা আরয করিলাম– 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনার অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল কেন?' তিনি বলিলেন–'কবরের চাপ ও ইহার আযাবের কথা আমার মনে হইয়াছিল। তৎপর আমি জানিলাম যে, আল্লাহ্ যয়নবের উপর কবরের চাপ ও শাস্তি সহজ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু

তথাপি কবর তাহাকে এমন জোরে চাপ দিতেছে যে, সকল প্রাণী উহার আওয়ায শুনিতে পাইতেছে।" রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"কবরে কাফিরকে শাস্তি দিবার জন্য নিরানব্বইটি বিষধর অজগর নিযুক্ত করা হয়। সেই অজগর কিরূপ তোমরা জান কি? নিরানব্বইটি সর্প, প্রত্যেকটির নূতন নূতন মস্তক হইয়া থাকে। উহারা সেই কাফিরকে দংশন করে, তাহাকে জড়াইয়া ধরে এবং ফোঁস ফোঁস করিতে থাকে। কিয়ামত পর্যন্ত এই অবস্থাই চলিবে।" তিনি বলেন—"কবর আখিরাতের প্রথম মঞ্জিল। ইহা নিরাপদে পার হইতে পারিলে তৎপরে যাহা ঘটিবে তাহাও নিতান্ত সহজ হইবে। আর কবরেই যাহার কষ্ট হইবে, ইহার পরবর্তী ঘটনাবলী তাহার জন্য ইহা অপেক্ষা বহুগুণে কষ্টদায়ক ও কঠিন হইবে।"

কবর-আযাবের পরবর্তী বিভীষিকা–কবর-আযাবের পরও মৃত ব্যক্তিকে আরও অনেক বিভীষিকার সম্মুখীন হইতে হইবে। তন্মধ্যে প্রথমটি প্রলয়ের শৃঙ্গধ্বনি। তাহার পর কিয়ামত-দিবসের বিভীষিকা, হিসাবের দিনের দীর্ঘতা, প্রখর গ্রীষ্ম ও অত্যধিক ঘর্ম। তৎপর পাপের জন্য প্রশ্ন, আমলনামা ডান বা বাম হস্তে প্রাপ্তি, আমলনামা প্রাপ্তিজনিত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, তুলাদণ্ডে পুণ্য বা পাপের পাল্লা ভারী হয় দেখিবার অধীর প্রতীক্ষা, দাবীদার হকদার ও উৎপীড়নের ক্ষতিপূরণের দায়, পুলসিরাত পার হইবার বিভীষিকা, দোযখ ও ইহার ফিরিশতাগণ, গলবন্ধনের শৃঙ্খল, 'যক্কুম' নামক বিষবৃক্ষ, সাপ-বিচ্ছুর দংশন ইত্যাদি নানাবিধ শাস্তির ভয়। এই সকল শাস্তি দুই প্রকার; যথা–(১) মানসিক শাস্তি, (২) শারীরিক শাস্তি। শারীরিক শাস্তির অবস্থা 'ইয়াহ্‌ইয়াউল-উলূম' গ্রন্থের শেষ ভাগে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহার প্রমাণাদিও দেওয়া হইয়াছে। মৃত্যুর পরিচয়–ইহা কি? আত্মার পরিচয়–মৃত্যুর পর ইহা কি অবস্থায় থাকে, এই সব বিষয় 'দর্শন-পুস্তকে' বলা হইয়াছে। যে ব্যক্তি শারীরিক শাস্তি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি 'ইয়াহ্‌ইয়াউল-উলূম' গ্রন্থে দেখিবেন এবং মানসিক শাস্তি সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে এই গ্রন্থের দর্শন-পুস্তকে অনুসন্ধান করিবেন। শারীরিক ও মানসিক শাস্তির কথা পুনরুক্তি করিলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে। বুযুর্গগণ স্বপ্নে মৃতদের যে-সকল অবস্থা জানিতে পারিয়াছেন কেবল তাহাই এইস্থলে বর্ণনা করিয়া এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিব।

মৃত ব্যক্তিদের অবস্থা– জীবিত লোকে মৃতদের অবস্থা কাশ্‌ফ দ্বারা,

নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে এবং জাগ্রতাবস্থায় জানিতে পারে বটে; কিন্তু পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইহা জানা যায় না। কারণ, মৃত ব্যক্তি যেই রাজ্যে গিয়াছে, সেই রাজ্যের অবস্থা পঞ্চ ইন্দ্রিয় জানিতে পারে না। কর্ণ যেমন বর্ণ বুঝিতে পারে না, চক্ষু শব্দ শুনিতে পায় না, ইন্দ্রিয়ও তদ্রূপ পরজগতের অবস্থা জানিতে পারে না। তবে মানবের মধ্যে ইন্দ্রয়াতীত এমন এক বিশেষ শক্তি আছে যদ্দারা সে পরজগতের ব্যাপারে অবগত হইতে পারে। কিন্তু এই শক্তি ইন্দ্রিয়াদির ব্যস্ততা ও দুনিয়ার কর্মব্যাপৃতির কোলাহলে লুকাইয়া থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় মানব এই সকল কর্মব্যস্ততা হইতে নিস্তার পায়। তখন মানবের সেই গুপ্ত শক্তি মৃতদের অবস্থার কিঞ্চিৎ নিকটবর্তী হয় এবং মৃতদের অবস্থা তাহার নিকট প্রকাশ হইতে থাকে। এই কারণেই মৃত ব্যক্তিগণও জীবিতদের খবর পাইয়া থাকে; এমন কি তাহারা আমাদের সৎকার্যে সন্তুষ্ট এবং পাপকার্যে দুঃখিত হয়। এই মর্মে বহু হাদীস বর্ণিত আছে।

প্রকৃত কথা এই– মৃতের অবস্থা জীবিতের নিকট এবং জীবিতের অবস্থা মৃতের নিকট কেবল লওহে মাহফূযের মধ্যবর্তিতায় প্রকাশ পায়। কারণ, আমাদের ও তাহাদের সকল অবস্থা লওহে মাহ্‌ফূযে অঙ্কিত আছে। নিদ্রিত অবস্থায় লওহে মাহ্‌ফূযের সহিত মানব-মনের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় বলিয়া স্বপ্নযোগে মৃতদের অবস্থা তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অপরপক্ষে, মৃতদেরও লওহে মাহফূযের সহিত সম্বন্ধ হয়। সুতরাং তাহারাও ইহা হইতে আমাদের অবস্থা জানিয়া লয়।

লওহে মাহ্‌ফূয–লওহে মাহ্‌ফূয এমন আয়নার সদৃশ যাহাতে বিশ্বজগতের সকল বস্তুর চিত্র বর্তমান আছে। মৃত ও জীবিত উভয় প্রকার লোকের আত্মাই আয়নাতুল্য। এবং আয়নার ছবি যেমন অপর আয়নাতে প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ লওহে মাহ্‌ফূযের ছবিগুলিও জীবিত ও মৃত লোকের আত্মার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। লওহে মাহ্‌ফূযকে কাঠ বা বাঁশ ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত এমন একটি ফলক বলিয়া মনে করিও না যাহা বাহ্য চক্ষে দৃষ্টগোচর হইতে পারে এবং ইহাতে লিখিত বিষয় পাঠ করা যাইতে পারে। লওহে মাহ্‌ফূয কোন্ বস্তুর সদৃশ জানিতে চাহিলে তুমি নিজের মধ্যেই অনুসন্ধান কর। কারণ, সমস্ত বিশ্বজগতে যাহা কিছু আছে উহার নমুনা ও মিশ্রণ আল্লাহ তোমার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন যাহাতে তুমি সকল পদার্থই চিনিতে পার। কিন্তু তুমি নিজেই নিজেকে চিনিতে পার নাই; এমতাবস্থায় অপরকে চিনিবে কিরূপে?

লওহে মাহফূযের নমুনা হাফিযের মস্তিষ্ক। হাফিয সমস্ত কুরআন শরীফ স্মরণ করিয়া রাখেন। সমগ্র কুরআন যেন তাঁহার মস্তিষ্কে চিত্রিত থাকে এবং তিনি ইহার অক্ষর ও ছত্র দেখিতে পান। কিন্তু কেহ হাফিযের মস্তিষ্ক উন্মোচন করিয়া উহাকে সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মা ভাগে বিভক্ত করত তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেও বাহ্য চক্ষে উহাতে কুরআন বা অন্য কিছু লিখিত দেখিতে পাইবে না। বিশ্ব জগতের সমস্ত ব্যাপার লওহে মাহ্ফূযে লিখিত আছে, এই কথার অর্থ তোমরা এই উপমা হইতে বুঝিয়া লইবে। লওহে মাহ্ফূযে অনন্ত ব্যাপার চিত্রিত আছে। তোমার চক্ষু সসীম। কাজেই সসীম সীমাবদ্ধ স্থানে অসীম অনন্ত ব্যাপার চিত্রিত হওয়া সম্ভবপর নহে। আল্লাহ যেমন তোমার সদৃশ নহেন তদ্রূপ তাঁহার মুখ, হাত বা তাঁহার লওহে মাহ্ফূয, কলম ইত্যাদি তোমার কোন বস্তুর অনুরূপ নহে।

যাহা হউক, এই পর্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল তাহার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি বুঝিতে পারিবে–আমাদের খবর মৃতদের নিকট এবং তাহাদের খবর আমাদের নিকট প্রকাশ পাইয়া থাকে। স্বপ্নযোগে জীবিত লোকে মৃতদের অবস্থা দেখিতে পায়। মৃত ব্যক্তি ভাল অবস্থায় দৃষ্ট হওয়া, এইকথার এক বড় প্রমাণ যে, সে পরকালে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে; আর মন্দ অবস্থায় দৃষ্ট হওয়াও তদ্রূপ প্রমাণ যে, সেই ব্যক্তি আযাব ও বিপদে কালাতিপাত করিতেছে। মৃত ব্যক্তির আত্মা জীবিত থাকে এবং একেবারেই অস্তিত্বহীন ও অচেতন হইয়া পড়ে না, যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا اِلٰى قَوْلِهٖ مِنْ فَضْلِهٖ –

অর্থাৎ "যাহারা আল্লাহ্র রাস্তায় হত হইয়াছে তাহাদিগকে মৃত বিবেচনা করিও না; বরং জীবিত (মনে কর)। তাহারা তাহাদের প্রভুর নিকট জীবিকা পাইতেছে আল্লাহ্র দান হইতে। তিনি তাহাদিগকে যাহা দান করিয়াছেন তাহাতে তাহারা আনন্দিত আছে।" (সূরা আলে ইমরান, রুকূ ১৭)।

স্বপ্নে পরিজ্ঞাত মৃতদের অবস্থা – রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–"যেই ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখিল সে যেন আমাকে জীবিত দর্শন করিল। কারণ, শয়তান আমার আকৃতি ধরিতে পারে না।" হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–"আমি রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখিলাম যে, তিনি আমার উপর ক্রুদ্ধ আছেন। আমি নিবেদন

করিলাম–'হে আল্লাহ্র রাসূল, আমার কি অপরাধ হইয়াছে?' তিনি বলিলেন–'রোযা রাখিয়া পত্নীকে চুম্বন না করিয়া থাকিতে পার না?" হযরত ওমর (র) আজীবন আর কখনও তদ্রূপ কার্য করেন নাই। যদিও রোযা রাখিয়া স্ত্রীকে চুম্বন করা হারাম নহে, তথাপি না করাই উত্তম। সাধারণ লোকের পক্ষে যাহা সঙ্গত তাহা হইতেও সিদ্দীকগণ দূরে থাকেন। হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন–"হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহিত আমার ভালবাসা ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিবার আমার ইচ্ছা হইল। এক বৎসর পরে স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম, তিনি চক্ষুদ্বয় ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন–'এখন অবসর পাইলাম। আল্লাহ করুণাময় ও দয়ালু না হইলে বড় বিপদ হইত।" হযরত আব্বাস (রা) বলেন–"আমি স্বপ্নে আবূ লাহাবকে দোযখের অগ্নিতে জ্বলিতে দেখিয়া তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন— 'সর্বদাই আযাবে নিপতিত থাকি। কিন্তু যেহেতু রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সোমবার রজনীতে জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁহার জন্মের সুসংবাদ আমার নিকট পৌঁছে এবং আমি এই আনন্দে একটি গোলামকে আযাদ করিয়া দিয়াছিলাম, এই সওয়াবের বিনিময়ে সোমবার রজনীতে আমার উপর আযাব হয় না।"

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেন–"আমি রাসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত ওমরের (রা) সহিত উপবিষ্ট দেখিলাম। আমিও সেই মাহফিলে বসিয়াছিলাম। এমন সময় হঠাৎ হযরত আলী (রা) ও আমীর মু'আবিয়াকে (রা) তথায় উপস্থিত করানো হইল। তাঁহাদিগকে এক গৃহে প্রবেশ করাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। পরক্ষণেই দেখিলাম, হযরত আলী (রা) বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন– 'আল্লাহর শপথ, আমার হক সাব্যস্ত হইল।' তৎপর আমীর মু'আবিয়া (রা) সত্বর বাহিরে আসিয়া বলিতে রাগিলেন–'আল্লাহ্র শপথ, আমাকেও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।" হযরত ইমাম হুসায়ন রাযিয়াল্লাহু আন্হু শহীদ হইবার পূর্বে একদা হযরত ইব্নে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা নিদ্রা হইতে উঠিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ – অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং

অবশ্যই আমরা তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"ব্যাপারি কি?" তিনি বলিতে লাগিলেন–"যালিমগণ হযরত হুসায়ন (রা)-কে হত্যা করিয়াছে।" লোকে জিজ্ঞাসা করিল–"আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন?" তিনি বলিলেন– আমি রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্ন দেখিলাম; তাঁহার নিকট রক্তে পরিপূর্ণ একটি কাঁচপাত্র আছে। তিনি বলিলেন–'হে ইব্‌নে আব্বাস, দেখিলে, আমার উম্মত আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিল? তাহারা আমার দৌহিত্র হুসায়নকে (রা) হত্যা করিল! তাঁহার এবং তাঁহার সঙ্গীদের এই রক্ত বিচারের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে লইয়া যাইতেছি।" এই স্বপ্নের চব্বিশ দিন পর খবর আসিল বাস্তবিক হযরত হুসায়নকে (রা) যালিমগণ শহীদ করিয়াছে।

হযরত আবূ বকর রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুকে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়া বলিলেন–"আপনি সর্বদা রসনার দিকে ইশারা করিয়া বলিতেন–'এই মাংসখণ্ড আমার উপর বহু কার্যের ভার চাপাইয়া দিয়াছে।' তিনি বলিলেন– হাঁ, এই রসনা দ্বারা আমি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ কলেমা পাঠ করিয়াছি এবং ইহার বিনিময়ে আল্লাহ্ আমার সম্মুখে বেহেশ্‌ত রাখিয়া দিয়াছেন।" হযরত ইউসুফ ইব্‌নে হুসায়নকে (র) কেহ স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"আল্লাহ্ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?" তিনি বলিলেন– "আমার প্রতি দয়া করিয়াছেন।" সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন–"কোন্ আমলের জন্য?" তিনি বলিলেন–"এই কারণে যে, আমি কখনও সত্য কথার সঙ্গে হাসি তামাশা মিলাই নাই।" হযরত মনসূর ইব্‌নে ইসমাঈল (র) বলেন–"আমি আবদুল্লাহ্ বস্ত্র বিক্রেতাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম–'আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে কি ব্যবহার করিলেন?' তিনি বলিলেন–'যে পাপ আমি স্বীকার করিয়াছি, আল্লাহ্ তাহা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু একটি পাপ স্বীকার করিতে আমার বড় লজ্জা হইল। উহা তিনি ক্ষমা করেন নাই। তজ্জন্য আল্লাহ আমাকে ঘর্মের মধ্যে দাঁড় করিয়া রাখিলেন। ইহাতে আমার বদনমণ্ডলে মাংস সম্পূর্ণ পচিয়া গলিয়া পড়িল।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম–'সেই পাপটি কি?' তিনি বলিলেন–'আমি একদা এক সুন্দর বালককে দেখিয়া তাহাকে বড় মনোরম বলিয়া মনে করিলাম। আল্লাহ্‌র নিকট এই পাপ স্বীকার করিতে আমার লজ্জা বোধ হইল।" হযরত আবূ জাফর জন্দলানী (র) বলেন–"আমি স্বপ্নে রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কতিপয় সূফীর সহিত উপবিষ্ট দেখিলাম। এমন সময় দুইজন ফিরিশতা আকাশ হইতে

নামিয়া আসিলেন। একজনের হাতে বদনা ও অপর জনের হাতে চিলমচি ছিল। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় পবিত্র হস্ত ধৌত করিলেন এবং তৎপর সূফীগণও নিজ নিজ হস্ত ধৌত করিলেন। আমার হস্তও ধৌত করিবার জন্য ফিরিশতাদ্বয় আমার সম্মুখে চিলমচি ও বদনা আনিলেন। ইতিমধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন–'তাঁহার হস্তে পানি ঢালিও না; তিনি এ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহেন।' আমি নিবেদন করিলাম–'হে আল্লাহ্‌র রাসূল, বর্ণিত আছে যে আপনি বলিয়াছেন–যে-ব্যক্তি যে সম্প্রদায়কে ভালবাসে সে সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। আমি এই সম্প্রদায়কে ভালবাসি।' রাসূলে মাক্‌বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফিরিশতাদিগকে বলিলেন–'তাহার হাতও ধোয়াইয়া দাও, এই ব্যক্তিও এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।"

'মজমা' নামক এক বুযুর্গকে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"আপনি কিরূপ ব্যবহার দেখিলেন?" তিনি বলিলেন –"সংসারবিরাগী ব্যক্তি ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল হস্তগত করিল?" এক ব্যক্তি হযরত যাররাহ ইব্‌নে আবূ আওফাকে (র) স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল– "কোন কার্য আপনি উত্তম দেখিলেন?" তিনি বলিলেন–"আল্লাহ্‌র বিধানে সন্তুষ্ট থাকা এবং আশা কম রাখা।" ইয়াযীদ ইবনে মাযউর বলেন– "আমি আযরাঈলকে (আ) স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম–'কোন আমল উত্তম আমাকে জানাইয়া দিন যেন আমি তদনুযায়ী কাজ করিয়া আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হইতে পারি।" তিনি বলিলেন–"আলিমের মর্যাদা অপেক্ষা উন্নত মর্যাদা আমি দেখি নাই, তৎপরই শোক-দুঃখ-ভারাক্রান্ত ব্যক্তির মরতবা দেখিতে পাইয়াছি।" এই ইয়াযীদ একজন বৃদ্ধ লোক ছিলেন। এই স্বপ্ন দর্শনের পর হইতে তিনি সর্বদা রোদন করিতেন। এমন কি রোদন করিতে করিতে অন্ধ হইয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। হযরত ইব্‌নে আয়নিয়া (র) বলেন–"আমি স্বপ্নে আমার ভ্রাতাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম–'আল্লাহ তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?" তিনি বলিলেন–' পাপের জন্য আমি ক্ষমা চাহিয়াছি তাহা তিনি ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন এবং যে পাপের ক্ষমা চাই নাই তাহা তিনি ক্ষমা করেন নাই।" হযরত যুবায়দকে (র) এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"আল্লাহ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?" তিনি বলিলেন–"তিনি আমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন।" সেই ব্যক্তি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন–'যে ধন আপনি মক্কা শরীফের পথে ব্যয় করিয়াছিলেন তজ্জন্য কি তিনি আপনার উপর অনুগ্রহ

করিয়াছেন?" তিনি বলিলেন–"না। ইহার সওয়াব ত সেই ধনের মালিক পাইয়াছেন। আমি কেবল আমার নিয়তের কারণে অনুগ্রহ পাইয়াছি।"

হযরত সুফিয়ান সাওরীকে (র) এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"আপনার সঙ্গে আল্লাহ্ কিরূপ ব্যবহার করিলেন?" তিনি বলিলেন–"আমি এক পদ পুলসিরাতের উপর এবং অপর পদ বেহেশ্‌তে রাখিলাম।" হযরত আহমদ ইবনে হাওয়ারী (র) বলেন–"আমি আমার পত্নীকে স্বপ্নে এত সৌন্দর্যশালিনী দেখিতে পাইলাম যে, এমন সৌন্দর্য আমি কখনও কাহারও মধ্যে দেখি নাই। অনুপম সৌন্দর্য ও নূরে তাহার বদনমণ্ডল ঝকমক করিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম–'তোমার বদনমণ্ডল এত উজ্জ্বল হওয়ার কারণ কি?' সে বলিতে লাগিল–'আপনার হয়ত মনে আছে, অমুক রজনীতে আপনি আল্লাহ্‌র যিকিরে নিমগ্ন থাকিয়া রোদন করিতেছিলেন।' আমি বলিলাম–'হাঁ, আমার মনে আছে।' সে আবার বলিতে লাগিল–'আপনার অশ্রু আমি আমার মুখমণ্ডলে লেপন করিয়াছিলাম। ইহাই আমার মুখমণ্ডলের সকল সৌন্দর্যের একমাত্র কারণ।" হযরত কাত্তানী (র) বলেন–"আমি হযরত জুনায়দকে (র) স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম–'আল্লাহ্ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?' তিনি বলিলেন– 'আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। সকল রচনা ও উপদেশবাণী বরবাদ হইয়াছে; এই সকল হইতে আমি কোন উপকারই পাই নাই। কিন্তু শেষরাতে আমি যে-দুই রাকা'আত নামায পড়িতাম তাহা কাজে লাগিয়াছে।" হযরত যুবায়দকে (র) এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল–"আল্লাহ্ আপনার সহিত কেমন ব্যবহার করিলেন?" তিনি বলিলেন –"এই চারি কলেমার জন্য আল্লাহ্ আমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَفْنِنِىْ بِهَا عُمْرِىْ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَدْخِلْ بِهَا قَبْرِىْ -

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَخْلُوْ بِهَا وَحْدِىْ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَلْقٰى بِهَا رَبِّىْ -

অর্থাৎ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কলেমার সঙ্গে যেন আমি আমার জীবন শেষ করিতে পারি। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কলেমা লইয়া যেন আমি কবরে যাইতে পারি। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, কলেমার সঙ্গে যেন আমি নির্জনে একাকী থাকি।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' কলেমা লইয়া যে আমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাত করি।"

হযরত বিশরে হাফীকে (র) এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"আল্লাহ্ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?" তিনি বলিলেন–"আল্লাহ্ আমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন–'তুমি কি আমার লজ্জা বোধ কর নাই যে, আমাকে এত অধিক ভয় করিয়াছ?" হযরত আবূ সুলায়মানকে (র) এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"আল্লাহ্ আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিলেন?" তিনি বলিলেন–"তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। পুণ্যবান লোকদের মধ্যে বিখ্যাত হওয়া ব্যতীত অপর কোন বিষয়ই আমার কোন ক্ষতি করে নাই।" হযরত আবূ সাঈদ খাররায (র) বলেন–"আমি শয়তানকে স্বপ্নে দেখিয়া তাহাকে মারিবার জন্য লাঠি উঠাইলাম। কিন্তু ইহাতে সে মোটেই ভীত হইল না। তখন গায়েবী আওয়ায শুনিলাম–'লাঠি দেখিয়া শয়তান ভয় পায় না। বরং হৃদয়ের নূর দেখিয়া সে ভয় পাইয়া থাকে।" হযরত সুব্বুহী (র) বলেন–"আমি শয়তানকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম– 'মানুষ দেখিতে কি তোর লজ্জা হয় না?' সে বলিল–'এই সকল লোক মানুষ নহে। তাহারা মানুষ হইলে বালকেরা ফুটবল লইয়া যেরূপ খেলা করে আমি তাহাদিগকে লইয়া তদ্রূপ খেলা করিতে পারিতাম না। তাহারাই ত মানুষ যাঁহারা আমাকে পীড়িত ও দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে।" এখানে সূফীগণকে মানুষ বলিয়া শয়তান লক্ষ্য করিয়াছিল। হযরত আবূ সাঈদ খাররায (র) বলেন–"দামেশকে অবস্থানকালে আমি স্বপ্নে দেখিলাম, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত ওমরের (রা) স্কন্ধে হাত রাখিয়া তশরীফ আনিতেছেন। তখন আমি স্বীয় বক্ষস্থলে অঙ্গুলী দ্বারা আঘাত করিতে করিতে একটি কবিতা পাট করিতেছিলাম। তিনি বলিলেন–'এই কার্যে উপকার অপেক্ষা ক্ষতি অধিক।'

হযরত শিবলীর (র) মৃত্যুর তিন দিন পরে এক ব্যক্তি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"আল্লাহ্ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?" তিনি বলেন– "খুব কঠিনভাবে আমার হিসাব লওয়া আরম্ভ হয়। ইহাতে আমি নিরাশ হইয়া পড়ি। আমার এই অবস্থা দেখিয়া তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন।" হযরত সুফিয়ান সাওরীকে (র) এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল– "আল্লাহ্ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?" তিনি বলিলেন–"আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন।" সেই ব্যক্তি আবার

জিজ্ঞাসা করিল–"আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক কি অবস্থায় আছেন?" তিনি বলিলেন–"প্রত্যহ তিনি দুইবার আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করিয়া থাকেন।" হযরত মালিক ইব্‌নে আনাসকে (রা) এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল–"আল্লাহ আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিলেন?" তিনি বলিলেন–"আমি হযরত ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট শুনিয়া যে-কলেমা লিখিয়াছিলাম ইহার বরকতে আল্লাহ্ আমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন। তিনি মৃত ব্যক্তিকে কবরে লইয়া যাইতে দেখিয়া বলিতেন– سُبْحَانَ اللّٰهِ الْحَىِّ الَّذِىْ لَايَمُوْتُ –

"এবং ইহার বরকতেই আমি আল্লাহর রহমত পাইয়াছি।" যে রাত্রে হযরত হাসান বস্‌রী (র) ইন্তিকাল করেন ঠিক সেই রাত্রে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁহার জন্য বেহেশতের সমস্ত দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে এবং গায়েবী আওয়ায হইতেছে– "হাসান বসরী (র) আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন।" হযরত জুনায়দ (র) বলেন–"আমি শয়তানকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম–'মানুষ দেখিয়া কি তোর লজ্জা হয় না?' সে বলিল–'ইহারা মানুষ নহে। শোনীযে যাঁহারা বাস করেন তাঁহারাই মানুষ; তাঁহারা আমাকে শোচনীয় অবস্থায় রাখিয়াছেন।" তিনি বলেন–'আমি প্রত্যুষে শোনীয় গ্রামের মসজিদে গেলাম এবং দেখিতে পাইলাম সেই স্থানের লোকগণ জানুর উপর মস্তক স্থাপনপূর্বক ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। তাঁহারা আমাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন–"হে জুনায়দ (র), অভিশপ্ত শয়তানের কথা শুনিয়া প্রতারিত হইবেন না।"

হযরত ওতবা ইবনে গোলাম (র) স্বপ্নে বেহেশতের এক হূর দেখিতে পাইলেন। হূর তাঁহাকে বলিল– "সাবধান, এমন কাজ করিবেন না যাহাতে আল্লাহ্ আমাকে আপনি হইতে বঞ্চিত রাখেন।" তিনি বলিলেন–"আমি দুনিয়াকে তিন তালাক দিয়াছি; আর কখনও ইহার নিকটে পর্যন্ত যাইব না। তাহা হইলে সেই হূরকে পাইতে পারিব।" হযরত আবূ আইয়্যুব সেজেস্তানী (র) এক কলহপ্রিয় লোকের মৃতদেহ দেখিয়া তাহার জানাযার নামাযে যোগ না দিবার অভিপ্রায়ে গৃহের উপর-তলায় আরোহণ করিলেন। এক ব্যক্তি এই মৃত লোকটিকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল–"আল্লাহ তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন" সেই ব্যক্তি বলিল–"আল্লাহ আমার উপর অনুগ্রহ করিলেন।" তৎপর সেই ব্যক্তি আরও বলিল–"আবূ আইয়্যুবকে বলিয়া দিবেন–'তোমাদের

হাতে আমার প্রভুর ধনভাণ্ডারের অনুগ্রহ বন্টনের ভার দেওয়া হইলে কৃপণতাবশত তোমরা কিছুই ব্যয় করিতে না।" যে-রাত্রে হযরত দাউদ তাঈ (র) ইন্তিকাল করেন সেই রাত্রে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিলেন, আকাশের ফিরিশতাগণ যাতায়াত করিতেছেন। তিনি ফিরিশতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন–"অদ্য কোন রাত্রি?" তাঁহারা বলিলেন –"অদ্য হযরত দাউদ তাঈ (র) ইন্তিকাল করিয়াছেন। তাঁহার জন্য বেহেশ্‌ত সাজানো হইয়াছে।" হযরত আবূ সাঈদ শিহাম (র) বলেন–"আমি সহল সালুকীকে স্বপ্নে দেখিয়া বলিলাম–'হে খাজা।" ইহা শুনামাত্র তিনি বলিলেন–'খাজার প্রভুত্ব আর নাই; মান-সম্ভ্রম সব নিষ্ফল হইয়াছে।' আমি বলিলাম–'আপনার এত কাজকর্ম কি হইল?' তিনি বলিলেন–'সেই সকল আমার কোন উপকারে আসে নাই; কিন্তু বৃদ্ধা মহিলাগণ আমার নিকট যে-সকল মাসআলা-মাসায়েল জিজ্ঞাসা করিতেন এবং আমি জওয়াব দিতাম কেবল সেইগুলি কাজে আসিয়াছে।"

হযরত রবী ইবনে সুলায়মান (র) বলেন–"আমি হযরত ইমাম শাফীঈ (র)-কে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম–'আল্লাহ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?' তিনি বলিলেন–'আমাকে সিংহাসনে বসাইয়া আমার জন্য অতি উজ্জ্বল মণিমুক্তা উৎসর্গ করিলেন।" হযরত ইমাম শাফীঈ (র) বলেন–"আমার সম্মুখে এক কঠিন কার্য উপস্থিত হয়। এইজন্য আমি হয়রান ছিলাম। ইতিমধ্যে আমি এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখিলাম; তিনি বলিলেন–'হে ইদরীস, পুড়ুন–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا مَوْتًا وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا وَّلَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اٰخُذَ اِلَّا مَا اَعْطَيْتَنِىْ وَلَا اَتَّقِىْ اِلَّا مَا وَفَّيْتَنِىْ اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِىْ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ فِىْ عَافِيَةٍ –

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আমার জীবন সম্বন্ধে আমার কোন ক্ষমতা নাই–আমার লাভ-ক্ষতি জীবন-মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের কোন ক্ষমতাই আমার নাই। তুমি যাহা দান না কর, তাহা গ্রহণের ক্ষমতাও আমার নাই। আর যাহা তুমি ত্যাগ করাইয়াছ তাহা ব্যতীত আমার কোন কিছু পরিত্যাগের ক্ষমতাও নাই

হে আল্লাহ্, যে-কথা ও কাজ তুমি ভালবাস এবং যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট থাক, তাহা আমাকে নিরাপদে করিতে দাও।" প্রভাতে নিদ্রা হইতে জাগিয়া আমি 'দু'আ পাঠ করিলাম। দ্বিপ্রহরের পূর্বেই উক্ত কাজ আমার জন্য সহজ হইয়া পড়িল।" প্রিয় পাঠক, তোমাদেরও এই দু'আ মনে রাখা আবশ্যক।

এক ব্যক্তি হযরত ওতবা ইবনে গোলামকে (র) স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন–"আল্লাহ আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন?" তিনি বলিলেন–"যে-দু'আখানা ঘরের দেওয়ালে লিখিত আছে তাহার বরকতে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন।" সেই ব্যক্তি জাগ্রত হইয়া হযরত ওতবার (র) হস্তাক্ষরে নিম্নলিখিত দু'আখানি দেওয়ালে লিখিত দেখিতে পাইলেন–

يَا هَادِيَ الْمُضِلِّيْنَ وَيَا رَاحِمَ الْمُذْنِبِيْنَ وَيَا مُقِيْلَ عَثَرَاتِ الْعَاثِرِيْنَ - اِرْحَمْ عَبْدَكَ ذَالْخَطَرِ الْعَظِيْمِ وَالْمُسْلِمِيْنَ كُلِّهِمْ اَجْمَعِيْنَ وَاجْعَلْنَا مَعَ الْاَحْيَاءِ الْمَرْزُوْقِيْنَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ -

অর্থাৎ "হে (আল্লাহ্), তুমি পথভ্রষ্টদের পথপ্রদর্শক; হে পাপীদের প্রতি করুণাকারী, দুর্বলচেতা উদভ্রান্তদিগের সুমতি বিধানকারী. তোমার এই ভীতিবিহ্বল দাসের প্রতি এবং সকল মুসলমানের প্রতি তুমি করুণা কর এবং আমাদিগকে নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও নেককার ও লোকদের অন্তর্ভুক্ত কর যাঁহারা তোমার নিকট হইতে জীবিকা পাইতেছেন এবং তুমি যাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছ। আমীন, হে বিশ্বজগতের প্রভু, আমীন।"

মৃত্যু-চিন্তা সম্বন্ধে এই পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাই যথেষ্ট।

উপসংহার

এই পর্যন্ত লিখিয়া 'কীমিয়ায়ে সা'আদত' (সৌভাগ্যের পরশমণি) গ্রন্থ সমাপ্ত করিলাম। আশা করি যাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করত ফললাভ করিবেন তাঁহারা মূল গ্রন্থকার ও অনুবাদকের মঙ্গলের জন্য দু'আ করিতে ভুলিবেন না এবং আল্লাহ্র নিকট তাঁহাদের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিবেন। রচনায় ভুলভ্রান্তি হইয়া থাকিলে বা বাহ্যাড়ম্বর ও রিয়া প্রবেশ করিয়া থাকিলে আল্লাহ যেন নিজ করুণায় ও সহৃদয় পাঠকগণের দু'আর বরকতে ক্ষমা করেন এবং গ্রন্থ প্রণয়ন ও অনুবাদের সওয়াব হইতে মাহরূম না করেন। কারণ, যে-ব্যক্তি মানব জাতিকে আল্লাহ্র দিকে আহবান করেন, অথচ নিজে রিয়ার দোষে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে বঞ্চিত থাকে তাহার ন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত আর কেহই নহে। আল্লাহ্ এই বিপদ হইতে রক্ষা করুন। তাই এই দু'আর সহিত গ্রন্থ সমাপ্ত করিতেছি–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَنَعُوْذُ بِرِضَائِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ -

"হে আল্লাহ্, তোমার শাস্তি হইতে (বাঁচিবার জন্য) আমরা তোমারই ক্ষমার আশ্রয় চাহিতেছি; আর তোমার ক্রোধ হইতে (রক্ষা পাইতে) তোমারই সন্তুষ্টির আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি; এবং তোমা হইতে (ভয়শূন্য হইতে) তোমারই আশ্রয় চাহিতেছি। তোমার গুণ কীর্তন করিয়া শেষ করা আমার সাধ্যের অতীত। তুমি নিজে তোমার যে-প্রশংসা করিয়াছ উহাই তোমার জন্য শোভন। সকল প্রশংসাই আল্লাহ্র; তিনি এক ও অদ্বিতীয়।"

ইফাবা—২০০৩-২০০৪—প্র/৫৭৩২(উ)—৭,২৫০
প্রকাশনা নম্বর ঃ ১৬২৯